মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১

পিনাকী ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটা ডমিন্যান্ট বয়ান আছে আমাদের দেশে। এই বয়ান মূলত স্যেকুলারপন্থীদের তৈরি করা। সেখানে বলা হয়ে থাকে, আমেরিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল পক্ষে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ঠেকানোর জন্য আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। এই বয়ান তৈরি করেছে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন। আর মূলত বাংলাদেশের রুশপন্থী বামেরা এই বয়ান প্রচার করেছে। কেউ তাদের এই হেজিমনিক বয়ানকে কখনো চ্যালেইঞ্জ করেনি। আমেরিকান ডকুমেন্টগুলো অনলাইনে রিলিজ হওয়ার পরে আমরা নিখুঁতভাবে জানতে পারছি আমেরিকা আসলে কী চেয়েছিল, কেন চেয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, নিক্সন প্রশাসন এটা জানত। এটা নিয়ে নিক্সন প্রশাসনের কোনো সন্দেহ ছিল না, বহু আগে থেকেই। আর এটা এতই অনিবার্য ছিল যে, সেটাকে ঠেকানোর উদ্যোগ নেয়ার কোনো চেষ্টাও করেনি আমেরিকা। কিন্তু তাদের উদ্বেগের জায়গা ছিল ভিন্ন। সেটা হলো, পাকিস্তানের অংশে থাকা কাশ্মীর। যেন এই সুযোগে, ডিসেম্বরের যুদ্ধের শেষবেলায় ভারতীয় সব সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তান থেকে কাশ্মীর ছিনিয়ে নিয়ে না যায়। সেটা ঠেকানোই ছিল আমেরিকানদের উদ্বেগের বিষয়। প্রপাগাণ্ডায় আমরা শুনেছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়া ঠেকাতে নাকি আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। এইটাও ডাহা মিথ্যা কথা। খোদ নিক্সন প্রশাসন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে নানা ক্ষেত্রে সহায়তা দিয়েছিল।

আমেরিকা ঠিক সেইসময়ে পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের বাজারে বিনিয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছিল। পাকিস্তান ছিল এই গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্কের মধ্যস্থতাকারী। তাই আমেরিকার তরফ থেকে পাকিস্তানকে ডিল করার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সতর্কতা নিতেই হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিপুল আয়তনের মার্কিন ডকুমেন্টের কিছু নির্বাচিত ডকুমেন্ট নিয়েই এখানে আলোচনা হয়েছে, সবগুলো নিয়ে নয়। এই আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা বা কূটনীতি নিয়ে যে-সব বয়ান চালু ছিল বা আছে তার সাথে আমেরিকান ডকুমেন্ট মিলিয়ে যেন পাঠক পড়তে পারেন। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবারো মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ডকুমেন্টগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এই সিরিজটি মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝার জায়গাগুলো আরো পরিচ্ছন্ন করতে পারবে বলে আমাদের আশাবাদ।

মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১

পিনাকী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

সৃজনশীল প্রকাশনায় ২৮ বছর পেরিয়ে...

সূচীপত্র

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ০১৫৫২-৪৫১৫৯২

মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১
পিনাকী ভট্টাচার্য

স্বত্ব © গ্রন্থকার
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ১ম সংস্করণ ❑ নভেম্বর ২০১৭
১ম সংশোধিত সংস্করণ ❑ সেপ্টেম্বর ২০১৭
২য় মুদ্রণ ❑ আগস্ট ২০১৭
১ম মুদ্রণ ❑ আগস্ট ২০১৭
প্রথম প্রকাশ ❑ আগস্ট ২০১৭
প্রচ্ছদ ❑ সাঈদ বারী
বর্ণবিন্যাস ❑ শাওন কম্পিউটারস্
মুদ্রণ ❑ জে. এম প্রিন্টিং প্রেস, শিংটোলা, ঢাকা ১১০০

ভারতে পরিবেশক ❑ রাজু বুক স্টোর স্টল নং ৭, ব্লক-২, কলেজ স্কয়ার (দক্ষিণ), সূর্যসেন স্ট্রিট, কলকাতা,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশক ❑ মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট্স, নিউ ইয়র্ক, www.muktadhara.com,
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন,
কানাডায় পরিবেশক ❑ এটিএন বুক এন্ড ক্রাফ্টস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ অ্যাভিনিউ, টরেন্টো
অনলাইন বুকশপ ❑ www.rokomari.com/sucheepatra

Markin Documente Bangladesher Muktijuddho '71
by Pinaki Bhattacharya

Published by Saeed Bari, *Chief Executive*, Sucheepatra,
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100, Bangladesh.
Ph : (880-2) 01711-583049
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
Price : BDT. 200.00 Only. US $ 10.00. £ 7.00

মূল্য : ৳ ২০০.০০ মাত্র

ISBN 978-984-92130-7-9
এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও মতামত গ্রন্থকারের নিজস্ব –প্রকাশক

উৎসর্গ

ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফিলোসফার
গৌতম দাস

ভূমিকা

আমাদের দেশের লেখালেখি ও গবেষণার অন্যতম আগ্রহের বিষয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরের জাতিগত ও অর্থনৈতিক শোষণ নিপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ওপর আমাদের লেখক-গবেষকদের বেশ কিছু ভালো কাজ হয়েছে। মুক্তি সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায় পুরো দেশকে নানাভাবে স্পর্শ করেছিল। সর্বব্যাপী এই যুদ্ধের বিশালতাকে কোনও একক লেখায় স্পর্শ করা প্রায় অসম্ভব। তবুও অনেকে তার নিজের অবস্থান থেকে সেই ইতিহাস চর্চার কাজ করেছেন।

এর মাঝে বিভিন্ন দালিলিক উপস্থাপনাসহ হাসান হাফিজুর রহমানের ১৫ খণ্ডের মুক্তিযুদ্ধের দলিলকে সবচেয়ে বড় কাজ বলে বিবেচনা করা হয়। ওখানে প্রবাসী সরকারের কাজ, ফ্রন্টের লড়াই, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে দলিলাদি আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাড়া বিশ্ব থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। এই বিশালযজ্ঞ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় প্রবাসী সাধারণ বাঙ্গালি থেকে শুরু করে কূটনীতিকরা যুক্ত হয়েছিলেন। বিদেশে আমাদের অনেক বন্ধু নানাভাবে আমাদের এই প্রক্রিয়ায় সামিল হয়েছিল তাদের সবার ভূমিকার কারণে সেই সময় অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছিল। যা এক সময় সেইসব দেশের সরকারকে বাংলাদেশের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করেছিল। এসব নিয়ে আমাদের কূটনৈতিক উদ্যোগগুলোর বর্ণনাও সেখানে আছে। তারপরেও গণযুদ্ধে রূপ নেয়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে কোনও একটা কাজ দিয়ে বোঝা সম্ভব না।

মনে রাখতে হবে, তখন চলছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধের কাল। উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতির সমীকরণে দুই পরাশক্তির ভুমিকা ছিল। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্ব থেকে শুরু করে সামরিক পর্ব পর্যন্ত তারা নানাভাবে এই যুদ্ধের ফলাফলকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। আমাদের যুদ্ধের ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণে পরাশক্তির কূটনৈতিক ভুমিকার বড় অংশটাই এতকাল গোপন ছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমেরিকানরা সেইসব ফাইল (2001-2009

Archive for the U.S. Department of State) উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেইসব হাজার হাজার ডকুমেন্ট থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক অংশগুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এইসব দলিল অনেকক্ষেত্রেই আমাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে মিলবে না। বলা যায়, কিছু নতুন বিষয় উন্মোচন করবে। কিন্তু ইতিহাসের নির্মোহ বিশ্লেষণের জন্যে এইসব দলিল আমাদের এই যুদ্ধের নানান পর্বে বিশ্ব শক্তিগুলো কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল তা বোঝার জন্য জরুরি।

লেখক-চিন্তক পিনাকী ভট্টাচার্য-এর মোট একুশ পর্বে নোট আকারে ফেসবুকে প্রকাশিত এই দলিলগুলো অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এবার তা বই আকারে প্রকাশ হচ্ছে। বাংলা ভাষায় সম্ভবত এটাই এই বিষয়ে প্রথম কাজ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তিসমুহের ভুমিকা বোঝার জন্যে এই বই সাধারণ পাঠকদের সাহায্য করবে। যারা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণা কাজ করবেন বা আরো গভীরে গিয়ে কাজ করবেন তাদের জন্যে এই বই একটা ভালো রেফারেন্স হতে পারে।

এখানে অসহযোগ আন্দোলনের আগে থেকে আমাদের মুক্তিসংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানামুখী যোগাযোগ ও ভূমিকার উল্লেখ আছে। মূলত এই যুদ্ধের গতিমুখ কোনদিকে যাবে তা নিয়ে ভারতকে ভাবতে হয়েছে আবার অন্য ঠাণ্ডাযুদ্ধের সমীকরণে আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে হিসাব করতে হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলনের আগে চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আমেরিকার সমর্থন নেয়ার জন্যে তাঁর নানান রাজনৈতিক চিন্তার কথা আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছিলেন। যাতে করে আমেরিকা তাঁকে রাজনৈতিক বন্ধু হিসাবে বিবেচনা করে। বিচ্ছিন্ন না হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ন্যায্যভিত্তিক কনফেডারেশনের আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি বলেছিলেন। শুধু তাই না, তাঁকে তাঁর কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কথাও জানান।

মার্চ মাসের আগেই আমেরিকানদের কাছে বাংলাদেশের আলাদা হয়ে যাওয়ার বিষয়টা স্পষ্ট হতে আরম্ভ করে। কিন্তু কীভাবে হবে? তা তখনো স্পষ্ট হচ্ছিল না। দুই পক্ষের রাজনৈতিক নেতারা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিলেন। তারা আমেরিকান সহযোগিতার আশা করছিলেন। ঠিক সেই সময় চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল পাকিস্তানের মাধ্যমে। বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে নতুন গড়ে

উঠা চীনের সঙ্গে এই সম্পর্ককে দুর্বল হওয়ার ঝুঁকিও তখন আমেরিকার সামনে উপস্থিত হয়েছিল। নানান জটিলতায় আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দুই কর্মকর্তা হ্যারল্ড সান্ডার্স এবং স্যামুয়েল হজকিনসন পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে কিসিঞ্জারকে একটা মেমোর শেষ লাইনে লেখেন, 'আমরা সবাই এশিয়ার এক অস্থির অঞ্চলে সাত কোটি মানুষের একটি নতুন জাতিরাষ্ট্রের সম্ভাব্য জন্ম দেখতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা নিয়ন্ত্রক নই, এই সম্ভাব্য জন্ম কীভাবে হবে শান্তিপূর্ণ নাকি রক্তাক্ত পথে সে বিষয়ে হয়তো আমরা কিছু করতে পারতাম।'

১৯৭১-এ ধ্বংস আর আগুনে পোড়া ভিটে ছেড়ে পালাচ্ছে বাঙালিরা

ছবি কৃতজ্ঞতা : রঘু রাই, ম্যাগনাম ফোটোস

ক্র্যাকডাউন ও প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরুর প্রায় এক মাস কাল পর মার্কিনী বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ পাকিস্তান প্রসঙ্গে তিনটি অপশনের কথা ভাবে ১. পশ্চিম পাকিস্তানকে নিঃশর্ত সমর্থন ২. নিরপেক্ষতা, যা আসলে পুর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করবে ৩. ইয়াহিয়াকে একটি রাজনৈতিক ফয়সালার জন্য সাহায্য করা। বাস্তবে দেখা গেছে তারা তিন নম্বর অপশন নিয়েই অগ্রসর হয়েছে।

একটা যুদ্ধ হবে আর সেখানে পরাশক্তির অস্ত্রব্যবসা হবে না? কিন্তু কোন পক্ষে কিভাবে? দুই দিকে অস্ত্র গেলে তো সবচেয়ে ভালো হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই না হলেও কিছু প্রশ্ন উদ্রেককারী ঘটনা ঘটেছিল। যুদ্ধকালীন সময় পাকিস্তানের অস্ত্র সরবরাহের নীতিতে 'প্রাণঘাতী নয় এমন সরঞ্জাম এবং যন্ত্রাংশ সরবরাহ অব্যাহত রাখব' ঠিক করে। আবার দেখা যাচ্ছে প্রবাসী সরকার গঠন করার আগেই মুক্তিবাহিনীকে ক্ষুদ্র মারণাস্ত্র দিয়ে সহযোগিতার বিষয়ে সিআইএ'র প্রস্তাব নিয়ে অতি গোপনীয় গোয়েন্দা মিটিং-

এ ৯ এপ্রিল ওয়াশিংটনে আলাপ হচ্ছে। ধারণা করা হয়, মুজিববাহিনী প্রতিষ্ঠাতা সিআইএ'র রিক্রুট জেনারেল এসএস উবানকে দিয়ে এই মিশন সম্পন্ন করা হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে পাকিস্তান-বাংলাদেশ সমঝোতা উদ্যোগে প্রবাসী সরকারের একটি অংশের প্রক্রিয়া সামনে চলে আসে। সেই প্রক্রিয়া নিয়ে এখানে বিস্তর বিতর্ক ও সমালোচনা আছে। মূলত আওয়ামী লীগ গণপরিষদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইউম এই সমঝোতা উদ্যোগের দুতিয়ালি করেছিলেন। আটটি আমেরিকান ডকুমেন্টে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। বোঝা যাচ্ছে, এটা ছিল পরিকল্পিত উদ্যোগ। আলোচনায় তিনি নিজেকে প্রবাসী সরকারের প্রতিনিধি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মুশতাকের সুনির্দিষ্ট বার্তা নিয়ে এসেছেন বলে জানান। তাঁর প্রস্তাবিত বৈঠকে আমেরিকা, ভারত, পাকিস্তান ও আওয়ামী লীগকে রাখার এবং অবশ্যই তাতে শেখ মুজিবুর রহমানের অংশগ্রহণের উল্লেখ ছিল। জনগণের ওপর শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কারণে তাঁকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা যে সম্ভব নয় এটাও আমেরিকানদের বোঝানো হয়েছিল। তখন আমেরিকানদের জানানো হয়েছিল, বিচার করে মুজিবকে ফাঁসি দিলে পরিস্থিতির ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এদিকে কাইউম জানাচ্ছেন, বাংলাদেশের বিজয় সুনিশ্চিত অন্যদিকে বলছেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে সামনে রেখে যুদ্ধের আগের অবস্থা পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার কথা। আবার তিনি এই বিষয়ে আলোচনার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে খন্দকার মুশতাকসহ পাকিস্তানে যাওয়ার আগ্রহও দেখান। এইসব উদ্যোগে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমীকরণে তাদের সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের বাইরে এসে আমেরিকার দিকে থাকার প্রবল আগ্রহও বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়ে এখানে দেয়া ডকুমেন্টগুলো দেখলে ধারণা পরিস্কার করে নেয়ার পাশাপাশি পাঠকের নতুন কিছু কৌতূহলও তৈরি হতে পারে।

যুদ্ধের একটা পর্যায়ে পাকিস্তানীদের হাতে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচার করে ফাঁসি দেয়ার পরিকল্পনার কারণে উদ্বেগ বেড়ে যায়। এই সময় মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নানা ধরনের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। আবার দেখা যাচ্ছে, আমেরিকানরাও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার রাজনৈতিক গুরুত্বটা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল। এই পর্যায় এসে তারা শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার বিষয়টা অগ্রাধিকার দিয়েই বিবেচনা করেছিল এবং সেই অনুযায়ী পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জোসেফ ফ্যারল্যান্ডের মাধ্যমে সরাসরি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ করে শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার পরামর্শ দেয়া

হয়। উল্লেখ্য, এই সময় বাংলাদেশের শরণার্থী ও দুর্গত মানুষদের সহযোগিতায় জাতিসংঘের মাধ্যমে আমেরিকা ভালোভাবেই অংশ নিয়েছিল। ডকুমেন্টগুলো দেখে মনে হয়, এইসময় তারা বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার বাস্তবতা মেনে নিয়েছিল। তবে তা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার বিষয়ে তারা সতর্ক ছিল।

আমরা জানি, খন্দকার মুশতাকের আমেরিকানদের সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রস্তাবনা নিয়ে প্রবাসী সরকারের কোন অনুমোদন ছিল না। ভারতীয়রা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে কোনও সমাধানের উদ্যোগকে সহজভাবে নেয়নি। এসব নিয়ে প্রবাসী সরকারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণে আগস্টের পর থেকে খন্দকার মুশতাক নিজেকে আর আমেরিকানদের সামনে সেইভাবে প্রকাশিত করেননি। এমনকি তাঁর সঙ্গে কূটনীতিকদের সরাসরি যোগাযোগেরও কোনও কথা কোনও ডকুমেন্টে দেখা যাচ্ছে না। তাজউদ্দীন আহমেদ শুরু থেকেই যোগাযোগে ইচ্ছুক ছিলেন না। তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আলোচনা চালাতে রাজি ছিলেন যদিও ভারতীয়রা তাঁকে সে অনুমোদন দেয়নি। এই পর্যায় বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমেরিকান মূল্যায়ন 'অন্তত কিছু বাংলাদেশি (রাজনৈতিক নেতা) মনে করছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু ভারতের স্বার্থই রক্ষা করবে; তাই স্বাধীনতা শব্দটা তাদের কাছে মরীচিকার মতোই' বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৯৭১-এর নভেম্বরের শুরুতে ইন্দিরা গান্ধীর আমেরিকা সফরের আগে তাতে সিদ্ধান্তমূলক কিছু কাজ করার জন্যে আমেরিকানরা ইয়াহিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে একতরফা সেনা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক সমাধানের বিষয় তাঁর অবস্থান (সর্বোচ্চ ছাড়) জানার উদ্যোগ নিয়েছিল। যাতে সেই অনুযায়ী মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করতে সুবিধা হয়। চেষ্টা ছিল যেন সেখানে এই অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন হয়। নেপথ্যের এইসব উদ্যোগের বিষয়গুলো এই ডকুমেন্টগুলো প্রকাশের আগে প্রায় অজানাই ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানকে বিচার করে ফাঁসি দেয়ার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানী জেনারেলরা নিয়েছিল। সেই অনুযায়ী ২ আগস্ট সামরিক আদালত গঠন করে বিচার শুরু হয় ৩ ডিসেম্বর ফাঁসির রায় দেয়া হয়। এদিকে আমেরিকানরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল, মুজিব একটা প্রধান প্রতীকে পরিণত হয়েছেন, এর ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। এভাবে বিভিন্নভাবে দেখা যাচ্ছে, এই যুদ্ধে আমেরিকা নিজেকে কোনও একটা পক্ষের বা মধ্যস্থাকারী হিসাবে দেখাতে

একটা খুব ইন্টারেষ্টিং তথ্য এখানে পাওয়া যায়, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভায় সিআইএ ডিরেক্টর ৬ ডিসেম্বর বলছেন, ভারতের পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও সামরিক লক্ষ্য নেই তারা কাশ্মীর সুরক্ষিত রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে মুক্ত করে ফেলবে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে। এদিন নিক্সন খোলাখুলি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় তাদের আমেরিকান নীতি ব্যর্থ হয়েছে। নিক্সন এদিন জানান ভারতে সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সভা যখন চলছিল তখনই ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। ঘটনাপ্রবাহ কিন্তু সিআইএ'র ডিরেক্টরের ধারণা মতোই ঘটে যায়। নিশ্চয় গবেষকরা এর ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করবেন।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি যখন আমেরিকানদের প্রায় ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে তখনো কিন্তু তারা হাল ছেড়ে দেয়নি। চীনকে (ভারত সীমান্তে পাঠানো) দিয়ে ভারতকে কাবু করার একটা চেষ্টা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী যে এই যুদ্ধের কূটনীতির লড়াইয়ে তাদের কাবু করেছেন এটাও তখন তারা বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু নতুন সমীকরণ তৈরির সময় তখন আর নেই। এসবই ডকুমেন্টগুলো লাইনে লাইনে প্রকাশিত হয়ে আছে।

যুদ্ধের প্রায় শেষ প্রান্তে আমেরিকানরা তাদের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়েছিল। এ নিয়ে এতদিনের প্রচলিত বয়ান হচ্ছে, যা তা বাংলাদেশের বিজয়কে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু উন্মোচিত এইসব ডকুমেন্ট থেকে কিছু ভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে প্রচলিত বয়ানকে নাকচ করে দিচ্ছে। এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান থেকে আজাদ কাশ্মীর দখলে নিয়ে নেয়ার একটা আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি যুদ্ধটাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে নেয়ার একটা চিন্তা (তাঁর মন্ত্রিসভায় করা ব্রিফিং) ইন্দিরা গান্ধীর ছিল। আমাদের যুদ্ধ নিয়ে প্রচলিত আলোচনায় ভারতের ইস্টার্ন ফ্রন্ট ছাড়াও অন্য ফ্রন্টের যুদ্ধ আয়োজন তেমন আলোচনা হয় না। আবার পাকিস্তানের মিলিটারি নেতারা ভারতীয় কাশ্মীর দখলের সামরিক উদ্যোগ নিয়েছিল। এখানে এইসব হিমঘরে চলে যাওয়া ঘটনাগুলো বের হয়ে এসেছে।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সরাসরি মুখোমুখি হওয়ার ৭ দিনের মাথায় (১০ ডিসেম্বর) মোটামুটি পরাজয় স্বীকার করে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা পাকিস্তানী শীর্ষ সেনাকর্মকর্তারা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব নিয়ে ঢাকাস্থ জাতিসংঘের দপ্তরে হাজির হয়। যুদ্ধের এই পর্যায় এই পরিণতি সম্পর্কে অনেকেরই পূর্ব ধারণা ছিল। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের কৌশলগত স্থাপনাগুলোর ওপরও

এইসময় ভারতীয় বিমান আক্রমণ শুরু হয়। এই সময় বিদেশীদের বাংলাদেশ থেকে চলে যাওয়ার জন্যে ভারতীয় কিছুক্ষণ বিমানবন্দরে আক্রমণ স্থগিত করার কথা জানিয়েছিল। যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি কিভাবে এগিয়ে চলেছিল তা জানারও এক সুযোগ করে দিয়েছে এই ডকুমেন্টগুলো।

এর মধ্যেও ভূ-রাজনীতি নিয়ে দুই পরাশক্তির বিরোধ বেড়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে নিয়ে যাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা আমেরিকান তরফে ছিল। এই পর্যায় ভারতকে প্রকাশ্য সমর্থন দেয়ার সোভিয়েত নীতিকে সমালোচনা করে নিক্সন ব্রেজনেভকে চিঠি দিয়েছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যদি এই নীতি সবাই অনুসরণ করতে আরম্ভ করে তবে দুই পরাশক্তি ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে বলেও সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছিল। শুধু তাই না, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতের ওপর রাশিয়ানদের প্রভাব কাজে লাগানোর পরামর্শ দেয়া হয়। আমাদের যুদ্ধ নিয়ে দুই পরাশক্তির রাজনীতি বিষয়ে তেমন তথ্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চা হয় না। এখানে সেইসব ঘটনার বেশ কিছু সূত্র পাওয়া যাবে।

এই যুদ্ধের ভূ-রাজনীতিতে চীনকে ভুমিকা রাখার জন্যে কিসিঞ্জার ১২ ডিসেম্বর জাতিসংঘে চীনাদের স্থায়ী প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করেন। এরপরে জাতিসংঘের বৈঠকে যোগ দিতে ভুট্টো আমেরিকায় গিয়ে কিসিঞ্জারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমেরিকার ইগোকে উসকে দিতে ভুট্টো চীনাদের বরাতে জানান, তারা মনে করে আমেরিকা দুর্বল রাষ্ট্র। এতে কাজ হয়, আমেরিকা জাতিসংঘের প্রস্তাবে পাকিস্তানের ওপর ভারতের আক্রমণকে সোভিয়েত সমর্থিত 'নগ্ন আগ্রাসন' বলে উল্লেখ করে। তবে এসব ডকুমেন্ট দেখে মনে হয়েছে, এসব তারা করছে যুদ্ধটা যেন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আর কিছুদিন পর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পঞ্চাশ বছর অতিক্রম হবে। বিশাল ক্যানভাসের এই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে পাঠ-গবেষণা-ইতিহাস চর্চা চলছে। এই বইটি অবশ্যই এই ধারায় কম আলোচিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় খুলে দিবে। একটা যুদ্ধকে উপমহাদেশের ভূ-রাজনীতি থেকে বিশ্ব-রাজনীতির আলোকে তথ্য উপাত্তসহ জানা বোঝার জন্যে এই ধরনের একটা কাজ খুব জরুরি ছিল।

আবু বিন রিয়াজ
মিরপুর, ঢাকা

সূচিপত্র

১৫ ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কী আলাপ হয়েছিল
২১ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই আমেরিকানরা বুঝে গিয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে
২৬ মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা কোন নীতিতে অবস্থান নিয়ে কাজ করেছিল
৩২ আমেরিকা কি আসলে পাকিস্তানকে নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য দিয়েছিল
৩৫ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি আমেরিকার কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়ে যান জুলাইয়ে
৩৯ বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমেরিকার রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন
৪২ খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে আমেরিকার সরাসরি কথা হয়নি
৪৬ আমেরিকা একতরফা সেনা প্রত্যাহারে পাকিস্তানকে চাপ দেয়
৫০ আইয়ুব-ইয়াহিয়া অনেক আগেই বুঝে যায় পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা হতে যাচ্ছে
৫৬ কিসিঞ্জার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বাংলাদেশ সমস্যায় যুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন
৫৯ বাংলাদেশ নিয়ে সোভিয়েত-মার্কিন প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব
৬২ বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিতে আমেরিকান প্রতিক্রিয়া
৬৬ আমেরিকা চীনকে ভারত সীমান্তে সেনা পাঠাতে অনুরোধ করেছিল
৬৯ আমেরিকা কেন সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল?
৭৪ ১০ ডিসেম্বরেই পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের ইচ্ছে পোষণ করে
৭৭ ব্রেজনেভকে আমেরিকার হুঁশিয়ারি
৮০ ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে জড়াতে কিসিঞ্জার চীনকে উস্কে দিয়েছিল
৮৪ আমেরিকাকে তাঁতিয়ে দেয়ার জন্যে ভুট্টোর কৌশল
৮৭ কিসিঞ্জার সপ্তম নৌবহর পাঠানোর বিরুদ্ধে ছিলেন
৯০ মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিল আমেরিকা
৯৩ ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরে কিসিঞ্জার নিক্সনকে অভিনন্দন জানান

পরিশিষ্ট

৯৭ পাঠপ্রতিক্রিয়া

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১. ডিসকোর্স অন মেথড, রেনে দেকার্ত (অনুবাদ)
২. বালাই ষাট (স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কিত রচনা)
৩. মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ : সাফল্যের তত্ত্ব তালাশ (ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্যে পেশাগত বই)
৪. ধর্ম ও নাস্তিকতা : বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব
৫. সোনার বাঙলার রুপালী কথা (কিশোরদের জন্যে রচিত বাঙলার ইতিহাস)
৬. রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় (রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা)
৭. মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনীতি (প্রবন্ধ সংকলন)
৮. নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু স্বল্প জানা বিষয় নিয়ে রচনা)
৯. ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
১০. মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম

সূচীপত্র থেকে গ্রন্থকারের প্রকাশিতব্য বই

- স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ
- চীন কাটুম (ছোটদের জন্যে চীন ভ্রমণকাহিনি/সূচীপত্র সংস্করণ)
- ওয়েদার মেকার (থ্রিলার সাইন্স ফিকশন/সূচীপত্র সংস্করণ)
- রবি বাবুর ডাক্তারি (সূচীপত্র সংস্করণ)

১

১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর কী আলাপ হয়েছিল

পাকিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালেই ঢাকায় বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসায় দেখা করতে এসেছিলেন। সেখানে এক ঘণ্টাব্যাপী আন্তরিক পরিবেশে ফারল্যান্ডের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা হয়। ফারল্যান্ড সেদিনই ওয়াশিংটনে এই আলোচনার বিস্তারিত জানিয়ে তারবার্তা পাঠান। কী ছিল সেই তারবার্তায়? আসুন ফারল্যান্ডের বয়ানেই শুনি সেই মিটিংয়ের খুঁটিনাটি। এটা সেক্রেটারি অব স্টেটকে পাঠানো রাষ্ট্রদূতের বার্তা :

১। ফেব্রুয়ারির ২৮ তারিখ সকাল নয়টায় আমি শেখ মুজিবরের সঙ্গে তাঁর ঢাকার বাসভবনে দেখা করতে যাই। তিনি গাড়িতেই আমাকে রিসিভ করেন এবং তাঁর বাসা পর্যন্ত আমাকে নিয়ে যান। এটা খুবই স্পষ্ট ছিল যে তিনি

আমাকে দেখে খুশি হয়েছেন এবং আমাকে দারুণ আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। সামাজিক কুশলাদি বিনিময়ের পরে মূল আলোচনা শুরু হল। সামাজিক কুশলাদির পর তাঁর এই বক্তব্যও ছিল, 'আমাদের এই মিটিংটা হচ্ছে পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে।' আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী অবস্থা মনে হচ্ছে আপনার?' এই কথা বলে তিনি সরাসরি মূল আলোচনায় প্রবেশ করলেন। আমি উনাকে বললাম, একজন কৌতূহলী দর্শক হিসেবে সব ঘরানার সংবাদপত্র থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিয়ে যে সংবাদ দেখি তাতে আমি উদ্বিগ্ন। তবে আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে আপনিই বরং বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা ভালোভাবে করতে পারবেন। আপনার কাছে থেকে সেটা শুনতে চাওয়াটাই বেশি সঙ্গত।

২। শেখ মুজিব বললেন, তাঁর মতে, বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা একমাত্র ভুট্টোর কুমন্ত্রণার কারণে হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন না। বরং ভুট্টো এমন একটা অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছেন, যা তৈরি হয়েছে সেইসব মানুষে র দ্বারা যারা আইয়ুবকে সমর্থন করেছিল। তিনি বলেন, ভুট্টো সম্ভবত নিজের ইচ্ছায় চলছেন না। কারণ তাঁর যথেষ্ট সংগঠিত কোনও রাজনৈতিক দল নেই। পশ্চিম পাকিস্তানি কিছু সামরিক অফিসারের সাহায্য ও নেতৃত্ব ছাড়া ভুট্টো অচল। ঠিক এই কারণেই ভুট্টো সামরিক প্রস্তুতির জন্যে মাত্রাতিরিক্ত খরচ করার পক্ষে।

৩। ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন কি-না আমার এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, তিনি মনে করেন ভুট্টো অধিবেশনে যোগ দেবেন। কারণ আওয়ামী লীগ ভুট্টোকে, তাঁর ভাষায় 'চেপে ধরেছে' বলে মনে করেন তিনি। যদিও তিনি বললেন, তিনি অনুমান করছেন ভুট্টো, যাকে তিনি 'হাদা গরু' বলে অভিহিত করেন, সেই ভুট্টো তাঁর দলের লোকদের খোঁয়াড়ে ঢুকিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষেই নিয়ে যাবেন। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের জীবন সংগ্রাম শুরু হবে।

৪। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, পিপিপি এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অবস্থানের দূরত্ব কতটুকু? তিনি বললেন, বিশাল দূরত্ব এবং এই দূরত্ব এতই বিশাল, যে-কোনও মতৈক্যে আসা রীতিমতো অসম্ভব। আরো বিশেষ করে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ এবং সেই দলের নির্বাচিত নেতা

হিসেবে তিনি ছয় দফা প্রশ্নে কোন আপোস করবেন না এবং তা করতেও পারেন না। এই ছয় দফাকে তিনি প্রায় এক দশক ধরে নিজের জীবনের অংশ করে নিয়েছেন। তিনি বললেন, ভুট্টো চান পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে মনোনীত করার অধিকার পেতে। শেখ মুজিব বললেন, ভুট্টোর পররাষ্ট্রনীতি, তাঁর মতে যাচ্ছেতাই, ভুট্টোর কমিউনিস্ট চীনের প্রতি রয়েছে প্রবল অনুরাগ এবং ভারতের প্রসঙ্গে তিনি একরোখা। শেখ মুজিব এরপরে

কিসিঞ্জার ও মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড। এই বইয়ে নানা জায়গায় ফারল্যান্ডের উল্লেখ আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ফারল্যান্ড মার্কিন তরফে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন

তাঁর কমিউনিস্টবিরোধী অবস্থানের কথা দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাখ্যা করলেন এবং বললেন চীন এই অঞ্চলের জন্যে কী বিপদ সৃষ্টি করছে। ভারত প্রশ্নে তিনি মনে করেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের অবশ্যই ঐতিহাসিক ভালো সম্পর্ক পুনস্থাপন করা দরকার এবং আগের বাণিজ্য রুটগুলো চালু করা দরকার। তিনি এই মত দিলেন, ভুট্টো যা চান এবং বাংলাদেশের মানুষ যা দাবি করে এই দুই বিষয়ের পার্থক্য অনতিক্রম্য।

৫। এরপরে তিনি পুরো ১০ মিনিটের একটা ভাষণ দিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতার অংশ হতে পারতো। তিনি বললেন, "তাঁর দেশের" জনগণ তার পিছনে আছে, তিনি অল্প কিছু ছোট ছোট হার্ডকোর কমিউনিস্টদের দৌড়ের ওপর রেখেছেন। ভাসানীর ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। তিনি বললেন, কমিউনিস্টরা তাঁর দলের তিনজন নেতাকে খুন করেছে। তিনিও পাল্টা প্রতিজ্ঞা করেছেন, প্রত্যেক নিহত আওয়ামী লীগ নেতার জন্যে কমিউনিস্টদের তিনজনকে খুন করবেন এবং 'এইটাই আমরা করেছি'। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃত্বের হাতে যে কয়দিন জেলে কাটিয়েছেন সেটা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যদি ঐক্য রক্ষা করা না-ই যায়, তবে 'বুলেটের মুখে দাঁড়াতে' তাঁর কোনও ভয় থাকবে না। তিনি নাটকীয়ভাবে বলে উঠলেন, তিনি জেলের ভয়ে ভীত নন, এমনকি তাঁকে 'টুকরো টুকরো করে ফেললেও' জনগণের দেয়া ম্যান্ডেট থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না। তিনি স্বগোতোক্তির মত বলতে থাকলেন, তিনি বিচ্ছিন্ন হতে চাননি, বরং তিনি চেয়েছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে এমন একটি কনফেডারেশন, যেখানে বাংলাদেশের জনগণ বৈদেশিক সাহায্যের মাত্র ২০% নয় বরং একটা ন্যায্য হিস্যা পাবে। যেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রার ৬০% আসে সে অংশকে কীভাবে ইসলামাবাদ ভিখিরির মতো এই সামান্য ভাগ ছুঁড়ে দেয়?

৬। বৈদেশিক সাহায্যের প্রশ্নে শেখ সাহেব বললেন, পাকিস্তান এই মুহূর্তে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ভয়াবহ সংকটে আছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কার্যত শূন্য। এটা অবশ্য বাংলাদেশের জন্যে শাপেবর হয়েছে। কারণ তাঁর দলকে বশে আনার জন্যে আর্থিক সঙ্গতি পশ্চিম পাকিস্তানের নাই। তিনি আরো বললেন, 'পশ্চিম পাকিস্তান জাপানের কাছে একটা বড় ধরনের সাহায্য চাচ্ছে, সেটা যদি তারা পেয়ে যায় তবে তারা আমাদের অবস্থা খারাপ করে দেবে।' সেই মুহূর্তে তিনি স্পষ্টতই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমেরিকা এবং কনসোর্টিয়াম কি বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সাহায্য করবে? আমি তাঁকে বললাম, একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি নিশ্চয়ই জানেন আমেরিকা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে আগ্রহী। তবে আমাদের এবং কনসোর্টিয়ামের আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে দু'টা সীমাবদ্ধতা আছে :

১. আর্থিক সাহায্যের জন্যে যে ফান্ড এখন আছে, তা আগের তুলনায় সীমিত।

২. আর্থিক সাহায্যের প্রজেক্টগুলো সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করা হয় এবং মনিটর করা হয়। বিশেষ জোর দেয়া হয় সাহায্যগ্রহীতা দেশের জনশক্তি ও সরকারি কর্মকর্তাদের ফান্ডের ব্যবহারের বিষয়ে দক্ষতা জ্ঞান এবং প্রকল্পের প্রশাসনিক দিক সামলানোর ক্ষমতার ওপরে।

আমি বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে গ্রামীণ উন্নয়নের জন্যে ফান্ডের অপ্রতুল ব্যবহার এবং দক্ষ জনশক্তির অভাবের বিষয়ে আমার উদ্বেগের কথা তাঁকে জানালাম।

৭। এরপরে শেখ মুজিব দীর্ঘ সময় নিয়ে জানালেন, কেন পূর্ব পাকিস্তান একটা টেকসই অঞ্চল হিসেবে দাঁড়াতে পারে। তিনি গ্যাসের বিশাল রিজার্ভের কথা জানালেন, যা শুধু একটা পেট্রো কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির জন্যে স্থানীয়ভাবেই ব্যবহার করা যাবে তাই নয় বরং ভারতেও রপ্তানি করা যাবে। তিনি বললেন, তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ দুই বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। বোরো ধান চাষাবাদ হবে তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয়। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তানের অবিশ্বাস্য জন্মহারের কথা মনে করিয়ে দিলাম, তখন তিনি বললেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ তাঁর প্রধান লক্ষ্য হবে। আজকে যেভাবে পরিবার ছোট করার জন্যে চাপ দিতে হচ্ছে, সেটা না করেই তিনি মানুষকে পরিবার ছোট রাখার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।

৮। খুব সিরিয়াস মুডে শেখ মুজিব বললেন, যদিও তিনি বলতে চাচ্ছিলেন না, তবুও তাঁর বলা উচিত, আমেরিকার একটা বদনাম আছে– সে মতের অমিল হলেই তার বন্ধুকে ত্যাগ করে। তিনি মনে করেন, এই অঞ্চল নিয়ে মতের অমিল হবেই, তখন আমেরিকা সত্যিকারের পরীক্ষায় পড়বে। আমি শেখ মুজিবকে বললাম, আমি মনে করি তাঁর বক্তব্যটা খুবই যুক্তিযুক্ত, তবে আমেরিকা তার বন্ধুদের সাহায্যের জন্যে কোন ভূমিকা নেয় সে বিষয়ে আরেকদিন আলাপ করব। আমি আরো যুক্ত করলাম, আমরা এই বিশ্বাস থেকেই পাকিস্তানকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি দিয়ে সাহায্য করেছি। শেখ সাহেবের কৌশলী উত্তর ছিল, আমাকে যদি আমেরিকা এক বিলিয়ন ডলার দিত, আমি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আর গণতন্ত্রের শক্ত দেয়াল তৈরি করতাম।

৯। এই সব আলাপের পিছনে শেখ সাহেব যা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কী? সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে

আমি আমেরিকান নীতি যা স্টেট ৩৫৫৩৪-এ উদ্ধৃত আছে, তা ব্যাখ্যা করলাম। এবং আমি এমনভাবে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের উদ্বেগের কথা তুললাম না যেন কোনও অবস্থাতেই মনে না হয়, বাঙালিদের আশা আকাঙ্ক্ষার পক্ষে আমেরিকার অবস্থান পরিবর্তনীয় নয়। আমি যদিও এটা বলতে ভুললাম না যে, বৈদেশিক সাহায্য প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার নয়, যা থেকে অসীম আর্থিক সাহায্য পৃথিবীর সব সমস্যার সমাধানের জন্যে বেরিয়ে আসবে। এরপরে শেখ সাহেব প্রশ্নের আকারে না বলে বললেন, বাংলাদেশের সকল বন্ধুদের উচিত তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে ওদের নিরস্ত করা, যারা অস্ত্রের শক্তি ব্যবহার করে আমার 'দেশের জনগণকে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতে চায়'। তিনি বললেন, তিনি দীর্ঘসময় ধরে বিশ্ব রাজনীতির ছাত্র হিসেবে এটা জানেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য সাহায্যদাতা দেশগুলোর পশ্চিম পাকিস্তানকে এই ধরনের চাপ দেয়ার ক্ষমতা আছে, যদি তারা সেটা চায়। যেহেতু কোনও প্রশ্ন করা হয়নি তাই তার উত্তর দেয়া থেকে আমি বিরত থাকলাম। তবে এই কথার একটা উত্তর দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, আমরা যেই সময়ের কথা চিন্তা করি তার আগেই। তাই এ নিয়ে সিরিয়াসভাবে ভাবা দরকার। আমি ধারণা করেছিলাম শেখ সাহেব স্বীকৃতির প্রসঙ্গটা তুলবেন, যেহেতু তিনি এই বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছিল, যা আমি রিপোর্টে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি তা করেননি।

আমি আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আবার কথা বলব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করলাম। যেহেতু এখন পর্যন্ত অনেক বিষয়ই অপরিষ্কার আছে, যা সামনের সময়গুলোতে পরিষ্কার হবে। মুজিব বললেন, তিনি আজকের মিটিংটার জন্যে আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন এবং যেকোন সময়ে পরবর্তী মিটিং-এ বসতে পারলে খুশি হবেন। এছাড়াও তিনি শুধু আমার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথাই নিশ্চিত করলেন না, তিনি বাংলাদেশ ও আমেরিকার জনগণের বন্ধুত্বের কথাও নিশ্চিত করলেন। এই আলোচনাটা এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে চলে এবং শেখ মুজিব আমাকে তাঁর অনুরক্ত সমর্থকদের মধ্যে দিয়ে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

সূত্র : National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL PAK–US. Confidential; Priority; Limdis. Repeated to Islamabad, Karachi, and Lahore.

২

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই আমেরিকানরা বুঝে গিয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হতে যাচ্ছে

১৯৭১ সাল যেমন আমাদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ঠিক তেমনই, তবে ভিন্ন কারণে হবু বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া আমেরিকার কাছে কূটনৈতিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ পাকিস্তানের মাধ্যমে এই সময়েই চীনের সঙ্গে কিসিঞ্জার এক গোপন বোঝাপড়া করতে যাচ্ছেন, যা দক্ষিণ এশিয়ায় আমেরিকার স্বার্থকে কয়েক দশকের জন্যে সুরক্ষা দেবে। এই সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকার কৌশলগত সম্পর্ক আর বাংলাদেশের সম্ভাব্য অভ্যুদয়কে নিক্সন প্রশাসন কীভাবে দেখেছে তা একালে বসে আমেরিকান চোখ দিয়েও দেখার প্রয়োজন আছে। অল্প কিছু ডকুমেন্ট ছাড়া এই সংক্রান্ত সব ডকুমেন্টই আমেরিকা এখন রিলিজ করেছে। ১৯৬৯ থেকে সে সম্পর্কিত ডকুমেন্টের শুরু; তবে ঠিক মুক্তিযুদ্ধ শুরুর

সময়কালকে ধরার জন্যে এখানে ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারি থেকে নির্বাচিত অংশগুলো পাঠকদের জন্যে তুলে ধরছি। আমেরিকানরা ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতেই বুঝে যায়, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হতে যাচ্ছে। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭০-এ হেনরি কিসিঞ্জার নিক্সন কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশেষ করে ভারত ও পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্যের বিষয়ে আমেরিকান পলিসি কী হবে তা নিয়ে গোপন জাতীয় প্রতিরক্ষা গবেষণার আদেশ দেন। সেই গোপন চিঠিতে পাকিস্তান প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে বলা হয় এই বলে, 'পাকিস্তান এখনো একটি সংবিধান রচনার পর্যায়ে আছে, তাই পাকিস্তান সম্পর্কে এই গবেষণার ফলাফলকে সাময়িক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এই সংবিধান রচনার পরে পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় তার উপরে গবেষণায় সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হবে'।[১]

সংবিধানের এই রেফারেন্সকে ১৯৭২ সালের সংবিধান বলে বোঝা ভুল হবে। এটা আসলে অখণ্ড পাকিস্তানের জন্যে হবু সংবিধানের কথা বলা হচ্ছে। কারণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ সদস্য হওয়াসহ একই সঙ্গে পুরো পাকিস্তানের জন্যে আগে একটা সংবিধান প্রণয়নের কথা ছিল– সম্ভাব্য সেই সংবিধানের কথা বলা হচ্ছে যা আর কখনই প্রণীত হয়নি কারণ পরে ঘটনাপ্রবাহে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ হেনরি কিসিঞ্জার গবেষক দলকে আরেকটি গোপন চিঠিতে, পূর্বোক্ত গবেষণায় পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে আমেরিকা কী পদক্ষেপ নেবে, সেটাও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করতে বলে দেন।[২]

২২ ফেব্রুয়ারির কিসিঞ্জার নিক্সনকে একটা মেমো দেন। এই চিঠিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের কাছে। এখানে শব্দের মারপ্যাঁচ নেই, সরল ভাষায় পরিস্থিতির ব্রিফিং দিচ্ছেন কিসিঞ্জার নিক্সনকে। কিসিঞ্জার পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার সম্ভাব্য পরিণতি আঁচ করেই নিক্সনকে বলছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভবত স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন।' তবে কিসিঞ্জার বলেন, 'স্বাধীনতার এই ঘোষণা একটি কৌশল হতে পারে। কিন্তু প্রদেশে জনগণ যেভাবে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছে তাতে শেখ মুজিব যা করতে চাইছেন সেটা করতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়।' স্বাধীনতার ঘোষণা একটি কৌশল হিসেবে কেন কিসিঞ্জার মনে

করেন তার একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান সম্প্রতি আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশের কূটনীতিকদের কাছে তিনি বার্তা দিয়েছেন, যদি তিনি তাঁর পরিকল্পনা মতো চলতে না পারেন এবং একতরফাভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন তাহলে যেন তারা (পশ্চিমারা) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে শান্তিরক্ষীর ভূমিকা রাখে।' কিসিঞ্জার নিক্সনকে আরো জানাচ্ছেন, 'এই ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমেরিকার নাই, যদিও পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনৈতিক নেতারাই আমেরিকানদের কাছে সমর্থনের জন্যে আসছে, এমনকি পাকিস্তানের কিছু কিছু দল থেকে আমেরিকা কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার জন্যে উস্কানি দেয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে। আমেরিকা জোরের সঙ্গে এই অভিযোগ অস্বীকার করে এবং এই ঘটনায় নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখছে। ঢাকার কনসাল জেনারেল শেখ মুজিবকে জানিয়েছেন, একটি সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে নেয়ার জন্যে এবং শেখ মুজিব যদি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান তবে আমেরিকানদের এই সংকটে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা তিনি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে গেছেন।' তবে কিসিঞ্জার মনে করছেন 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভবত হচ্ছেই। সে ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের প্রতি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' কারণ কিসিঞ্জার বলছেন, 'শেখ মুজিব আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন। এবং তিনিই সেদিন আমাদের সহায় হতে পারেন যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে নেগোশিয়েট করতে হবে।'[৩]

১ মার্চে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দুই কর্মকর্তা হ্যারল্ড সান্ডার্স এবং স্যামুয়েল হজকিনসন পাকিস্তানের অবস্থা নিয়ে কিসিঞ্জারকে একটা মেমো লেখেন। সেখানে ভুট্টোকে বাদ রেখে ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে নেগোশিয়েশনের একটি সম্ভাবনার কথা বলা হয়, যা কিনা সিআইএ'রও প্রস্তাব ছিল। আবার 'এই ধরনের নেগোশিয়েশন পশ্চিম পাকিস্তানে এমনকি আর্মির মধ্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে। স্বাধীন বাংলাদেশের সম্ভাব্য জন্মের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমেরিকা এখন কী করবে' সেই প্রশ্ন তোলা হয়। মেমোটি শেষ হয় যেই বাক্য দিয়ে তা হচ্ছে : 'We are after all witnessing the possible birth of a new nation of over 70 million people in

an unstable area of Asia and, while not the controlling factor, we could have something to do with how this comes about—peacefully or by bloody civil war.'

'আমরা সবাই এশিয়ার এক অস্থির অঞ্চলে সাত কোটি মানুষের একটি নতুন জাতিরাষ্ট্রের সম্ভাব্য জন্ম দেখতে যাচ্ছি, যেখানে আমরা নিয়ন্ত্রক নই, এই সম্ভাব্য জন্ম কীভাবে হবে শান্তিপূর্ণ নাকি রক্তাক্ত পথে সে বিষয়ে হয়তো আমরা কিছু করতে পারতাম।'[৪]

১৯৭১-এ পাকিস্তান নিয়ে আমেরিকা কী ধরনের গ্যাঁড়াকলে পড়েছিল সেটা কিসিঞ্জারের সাম্প্রতিক একটা সাক্ষাৎকারে ফুটে উঠেছে। কিসিঞ্জার বলছেন, 'চায়নার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দ্বার খোলে ১৯৬৯ এ। বাংলাদেশ সংকট শুরু হয় ১৯৭১ সালে। এই সময়ের মধ্যেই আমরা চায়নার সঙ্গে একাধিক অতি গোপনীয় আলাপ করি এবং আমরা তখন বিরাট সাফল্য অর্জনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। এই কথোপকথনের মধ্যস্থতাকারী ছিল পাকিস্তান এবং পাকিস্তান বেইজিং ও ওয়াশিংটন উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য ছিল। বাংলাদেশ সংকট ছিল পাকিস্তানের বাঙালি অংশের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা। পাকিস্তান সেটাকে বীভৎস সহিংসতা দিয়ে প্রতিরোধ করতে যায় এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। প্রকাশ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টা নিন্দা করতে গেলে, তা পাকিস্তানি চ্যানেলটা নষ্ট করে দিত; যা চায়নার সঙ্গে সম্পর্ককে পরিপূর্ণভাবে উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে আরো কয়েক মাসের জন্যে দরকার ছিল। আমেরিকান ডিপ্লোম্যাট যারা বাংলাদেশের ট্র্যাজেডি অবলোকন করছিলেন তারা চায়নার এই বিষয়টা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাদের পাঠানো বর্ণনা হৃদয়বিদারক ও যৌক্তিক। অথচ আমরা প্রকাশ্যে এর নিন্দা করতে পারছিলাম না। কিন্তু আমরা দুর্গতদের জন্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সাহায্য দিয়েছি এবং পরিস্থিতির অবসানের জন্যে কূটনৈতিক চেষ্টা চালিয়ে গেছি। পাকিস্তানের মাধ্যমে চায়নার সঙ্গে সম্পর্ক পূর্ণভাবে স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই আমেরিকা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার জন্যে পাকিস্তানকে চাপ দিতে থাকে। নভেম্বরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, নিক্সনের প্রস্তাব অনুসারে, বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দিতে রাজী হয়।'[৫]

সূত্র

১. National Security Study Memorandam 109, December 19, 1970 by Henry Kissinger

২. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 365, Subject Files, National Security Study Memorandam, Nos. 104–206. Secret; Exdis. A copy was sent to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff.

৩. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 624, Country Files, Middle East, Pakistan, Vol. III, 1 Oct 70–28 Feb 71

৪. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 625, Country Files, Middle East, Pakistan, Vol. IV, 1 Mar 71–15 May 71. Secret. Sent for information

৫. World Chaos and World Order: Conversations With Henry Kissinger

৩

মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা কোন নীতিতে অবস্থান নিয়ে কাজ করেছিল

এটা ২৫ মার্চের গণহত্যার পর তিন সপ্তাহ পার হয়েছে, এই অবস্থায় কিসিঞ্জারের ড্রাফট করতে বসা এক দলিল। অর্থাৎ গণহত্যার পর এনিয়ে আমেরিকান সরকারের প্রতিক্রিয়া কী তা এখান থেকে আমরা পরোক্ষে হলেও জানতে পারব।

১৯৭১-এর ২৮ এপ্রিল মার্কিন বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন পলিসি অনুসারে আমেরিকার চলা উচিত সেই নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন দাখিল করে। সেই প্রতিবেদনে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিসের পরে তিনটা সম্ভাব্য পলিসি অপশন নিক্সনের বিবেচনার জন্যে পেশ করে সেখানে তাঁর নির্দেশনা চাওয়া হয়। প্রত্যেকটা অপশনের সাব হেডিং-এ সেই অপশন গ্রহণ করলে ইকোনোমিক সহায়তা কী হবে, খাদ্য সহায়তা কী হবে আর

মিলিটারি সহায়তা কী হবে সেটার একটা আউটলাইন দেয়া ছিল। আসুন, দেখি অপশনগুলো কী ছিল?

অপশন ১ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে বশে আনার জন্যে যা যা রাজনৈতিক ও মিলিটারি প্রোগ্রাম নেন সেটায় সমর্থন দেয়া।

অর্থনৈতিক সহায়তা : আমরা ঋণ মওকুফ সহায়তা দেব এবং পূর্ণ মাত্রায় উন্নয়ন সহায়তা দেব যখন পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের নিশ্চিত করবে এই সহায়তা যুদ্ধ অর্থায়নে ব্যবহৃত হবে না। যদিও আমরা জানি, এই সহায়তা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানেই ব্যবহৃত হবে; তবুও সেটা নিয়ে আমরা উচ্চবাচ্য করব না।

খাদ্য সহায়তা : পূর্ণ মাত্রায় খাদ্য সহায়তা দেব, এবিষয়ে যা যা অনুরোধ আছে সব চালান জাহাজে করে পাঠিয়ে দেব। পূর্ব পাকিস্তানে কীভাবে সেই খাদ্য বিতরিত হবে বা খাদ্যসাহায্য দেয়া থেকে বিরত থাকবে সে বিষয়ে কোন শর্ত আরোপ করব না।

মিলিটারি সহায়তা : গোলাগুলি ছাড়া সকল মিলিটারি সাপ্লাই পাঠিয়ে দেব। গুলি এবং গোলা পাঠানোকে আমরা কোন আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত না নিয়েই বিলম্বিত করব।

অপশন ২ : আমরা সত্যিকারের নিরপেক্ষতা বজায় রাখব।

অর্থনৈতিক সহায়তা : আমরা সকল সহায়তা বিলম্বিত করব যতক্ষণ পর্যন্ত না আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক সন্তুষ্ট হয় যে, সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যেভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাতে কর্মসূচি পুনর্গঠিত করা হয়েছে যাতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সমতাভিত্তিক বিতরণ করা হবে বিবেচনা নেয়া হয়েছে ।

খাদ্য সহায়তা : পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে বিতরণে বাধা না দিয়ে আমরা খাদ্যসাহায্য পাঠানো আবার শুরু করার আগে তাদের চাপ দেব যেন খাদ্যসাহায্য সারা পাকিস্তানে সমতার সঙ্গে বিতরণ করা হয়, সেটা নিশ্চিত করতে। বিশেষ করে সাইক্লোনদুর্গত এলাকায়, গ্রাম এলাকায় ও আর্মি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় যেন বিতরণ করা হয়।

মিলিটারি সহায়তা : গুলি এবং গোলাসহ সকল মিলিটারি সাপ্লাই এবং মৃত্যু হয় এমন মারণাস্ত্র, সেগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ পাঠানো বন্ধ করব। তবে প্রাণঘাতী নয় এমন অস্ত্রের ও খুচরা যন্ত্রাংশের চালান পাঠানো যেতে পারে।

অপশন ৩ : যুদ্ধ বন্ধে ইয়াহিয়াকে সিরিয়াসলি সাহায্য করা যেন ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এই বিবেচনা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যদি এই রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নস্যাৎ হয়ে যায় তবে

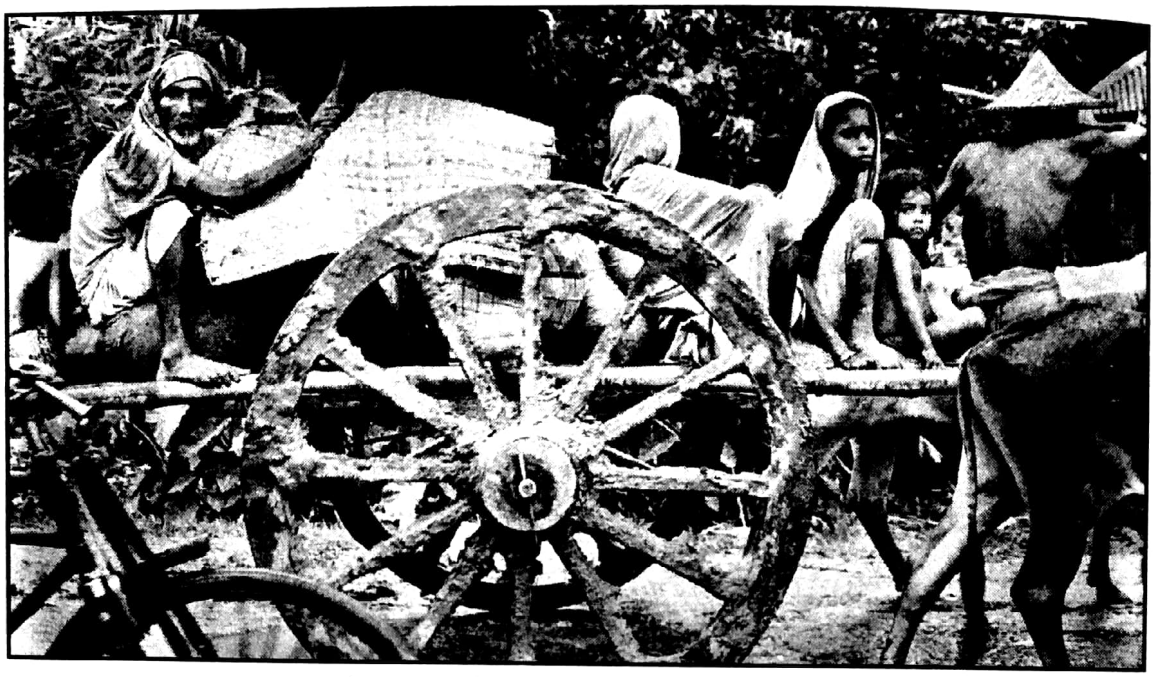

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের পথে শরণার্থীর স্রোত

আমেরিকান সাহায্য কমিয়ে ফেলতে হবে কারণ আমরা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ চালাতে পারব না। কিন্তু এই আপতকালীন সময়ের জন্যে আমাদের পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্যে জরুরী সাহায্য চালিয়ে যেতে হবে যেন তাদের উন্নয়ন কর্মসূচিকে যখন পূর্ব ও পশ্চিমে পুনর্গঠন করা হবে তখন এই ঝঞ্ঝাকে সে পেরিয়ে যেতে পারে। আমরা কোনও সাহায্য পাঠানোকে চাপ দেয়ার অজুহাতে থামিয়ে রাখব না। সাহায্য বন্ধের অপশন আমরা তখনই আনব যখন পশ্চিম পাকিস্তানকে নেগোশিয়েট করার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেয়া হবে এবং তারা যদি এতো সুযোগ পেয়েও তা ব্যবহার না করে।

অর্থনৈতিক সাহায্য : একটি কার্যকর মীমাংসা ও ফয়সালা করার পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্যোগের ভিত্তিতেও আমরা আমাদের এই প্রস্তাব রাখব। আমাদের এইটা বলতে হবে যে এটা আমেরিকা, বিশ্ব ব্যাংক এবং আই এম এফের আর্থিক সামর্থের নাগালের বাইরে চলে যাবে যদি এই অচলাবস্থা চলতে থাকে এবং পাকিস্তান তার আর্থিক অবস্থাকে আরো নাজুক করে ফেলে। আমাদের এটাও বলতে হবে যে, যদি এই সাহায্যকে যুদ্ধ অর্থায়নে ব্যবহার করা হয় তবে অর্থনৈতিক সাহায্য কমে যেতে পারে। আমরা বিশ্ব ব্যাংক এবং আই এম এফ কে স্বল্পমেয়াদী জরুরী সাহায্য প্রদানে এমনভাবে সমর্থন করব যেন সেই সময়ে পাকিস্তান উন্নয়ন অর্থায়নের জন্যে মূলনীতি

সাজিয়ে নিতে পারে–এটা করা হবে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির জন্যে সাহায্য কমিয়ে দেয়ার অজুহাত হিসেবে নয়। এই পদেক্ষেপ যে ন্যায়সঙ্গত হয়েছে সেটা প্রতীয়মান করার জন্যে ইয়াহিয়াকে পূর্ব পাকিস্তানে এমন প্রশাসন দিতে হবে যারা পর্যাপ্ত বাঙালি সমর্থন পায় এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় এবং আবারো সাংবিধানিক সংকট তৈরি না হয়। এবং এই সময়কালে আমরা যে সব জায়গায় উন্নয়ন কর্মসূচি বাধাগ্রস্থ হয়নি সেখানে নতুন ঋণ দেয়ার জন্যে নতুন ঋণ প্রস্তাব প্রক্রিয়া করব।

খাদ্য সহায়তা : আমরা খাদ্যসাহায্য খালাস হয়ে গন্তব্যে পৌছা শুরু করা মাত্রই আবারো খাদ্যসাহায্য পাঠানো শুরু করব। আমরা কোথায় কতটুকু খাদ্য যাবে তা স্থির করে দেব না, তবে সাইক্লোনে আক্রান্ত এলাকায় যতটুকু যাবে বলে আমাদের করা প্রতিশ্রুতি আছে তা রক্ষা করতে হবে। এই নীতি আমাদের সামগ্রিক অ্যাপ্রোচের মধ্যে নিহিত থাকবে যেন অত্যাবশ্যকীয় সেবা আবার চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যত ব্যাপকভিত্তিক বিতরণ করা যায়।

সামরিক সহায়তা : আমরা অর্থনৈতিক সহায়তার জন্যে যেই লাইন নিয়েছি সেইরকম লাইন নেব। বাস্তবিকই আমরা প্রাণঘাতী নয় এমন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ অব্যাহত রাখব যেন ইয়াহিয়া এই ধারণা না করতে পারে যে আমরা সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছি। তবে বিতর্কিত আইটেমগুলোর সরবরাহ বন্ধ রাখব যেন কংগ্রেস সব সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব না তোলে।

এরপরে প্রত্যেক অপশনের সুবিধা অসুবিধা ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

অপশন ১ : এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখা সহজ হবে। তবে অসুবিধা হচ্ছে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্তমান কর্মকাণ্ডকে আশকারা দেয়া হবে। ফলে আমাদের ও পাকিস্তানিদের জন্যে বর্তমান পরিস্থিতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি বেড়ে যাবে।

অপশন ২ : এর ফলে এমন একটা পজিশন নেয়া সম্ভব হবে যা প্রকাশ্যে বলা সম্ভব এবং ডিফেন্ড করা যাবে। অসুবিধা হচ্ছে, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যকে কমিয়ে দিলে বা বন্ধ করে দিলে তা পূর্ব পাকিস্তানকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করবে। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ করে ফেলব কিন্তু এতো কিছুর পরেও পূর্ব পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসার জন্যে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারব না।

অপশন ৩ : আমরা এই প্রস্তাবের সুবিধার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সম্পর্কের সুযোগে এমন একটা সমাধানে পৌছার চেষ্টা করতে পারব যা

SECRET — 6 —

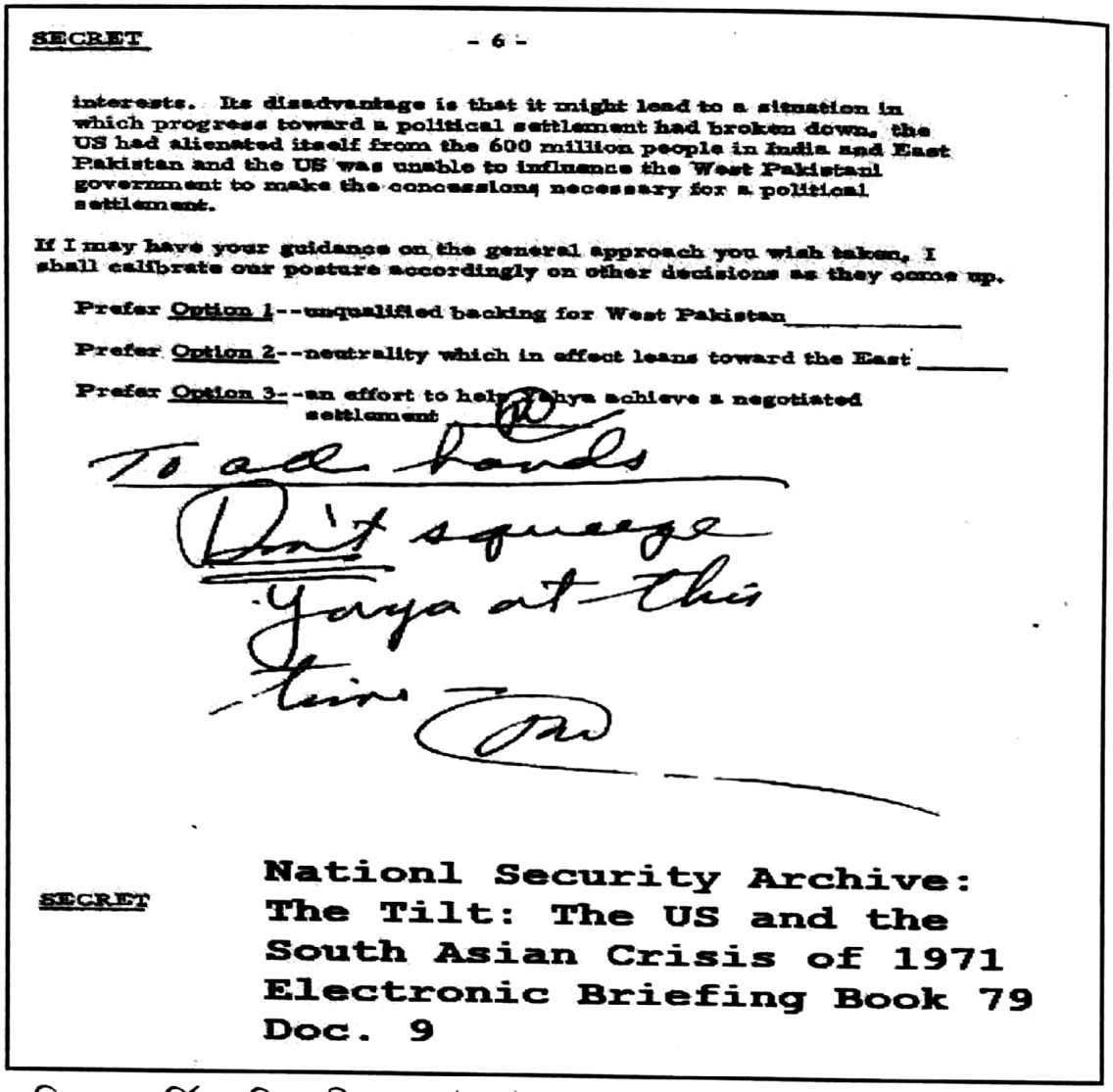

interests. Its disadvantage is that it might lead to a situation in which progress toward a political settlement had broken down, the US had alienated itself from the 600 million people in India and East Pakistan and the US was unable to influence the West Pakistani government to make the concessions necessary for a political settlement.

If I may have your guidance on the general approach you wish taken, I shall calibrate our posture accordingly on other decisions as they come up.

Prefer Option 1--unqualified backing for West Pakistan ______

Prefer Option 2--neutrality which in effect leans toward the East ______

Prefer Option 3--an effort to help Yahya achieve a negotiated settlement

To all hands

Don't squeeze

Yaya at this

time

SECRET

Nationl Security Archive:
The Tilt: The US and the South Asian Crisis of 1971
Electronic Briefing Book 79
Doc. 9

মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা কী হবে সেটার উপরে প্রেসিডেন্টের জন্যে তৈরি নোটে নিক্সনের নিজের হাতে অনুমোদন ও মন্তব্য

আমাদের ও পাকিস্তানের স্বার্থের জন্যে সবচেয়ে কম ক্ষতিকর। অসুবিধা হচ্ছে, যদি রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং পাকিস্তানকে কোনও ছাড় দিতে সম্মত করতে না পারে তবে আমরা ৬০ কোটি জনগোষ্ঠীর ভারত আর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ থেকে আমেরিকাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলব।

রিপোর্টের শেষে এক কথায় তিনটা অপশন দেয়া ছিল, এভাবে :

অপশন ১ : পশ্চিম পাকিস্তানকে নিঃশর্ত সমর্থন

অপশন ২ : নিরপেক্ষতা, যা আসলে পূর্ব পাকিস্তানকে সাহায্য করবে।

অপশন ৩ : ইয়হিয়াকে একটি রাজনৈতিক ফয়সালার জন্যে সাহায্য করা।

আমরা প্রচলিত সব বয়ানে জানি, আমেরিকা পাকিস্তানকে নিঃশর্ত সমর্থনের কৌশল নিয়েছিল। মানে এক নম্বর অপশন কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আমেরিকান এই ডকুমেন্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমেরিকা তিন নম্বর অপশন গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ ইয়াহিয়াকে একটি রাজনৈতিক ফয়সালার জন্যে সাহায্য করা। নিক্সন তিন নম্বর অপশন অনুমোদন দেয়ার সময় লিখেছিলেন :

'To all hands. Don't squeeze Yahya at this time.'

'সবাইকে বলছি, ইয়াহিয়াকে এই মুহূর্তে বেশি চাপ দিও না।'

সূত্র : Foreign Relations of the United States, 1969–1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971, No 36

৪

আমেরিকা কি আসলে পাকিস্তানকে নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য দিয়েছিল

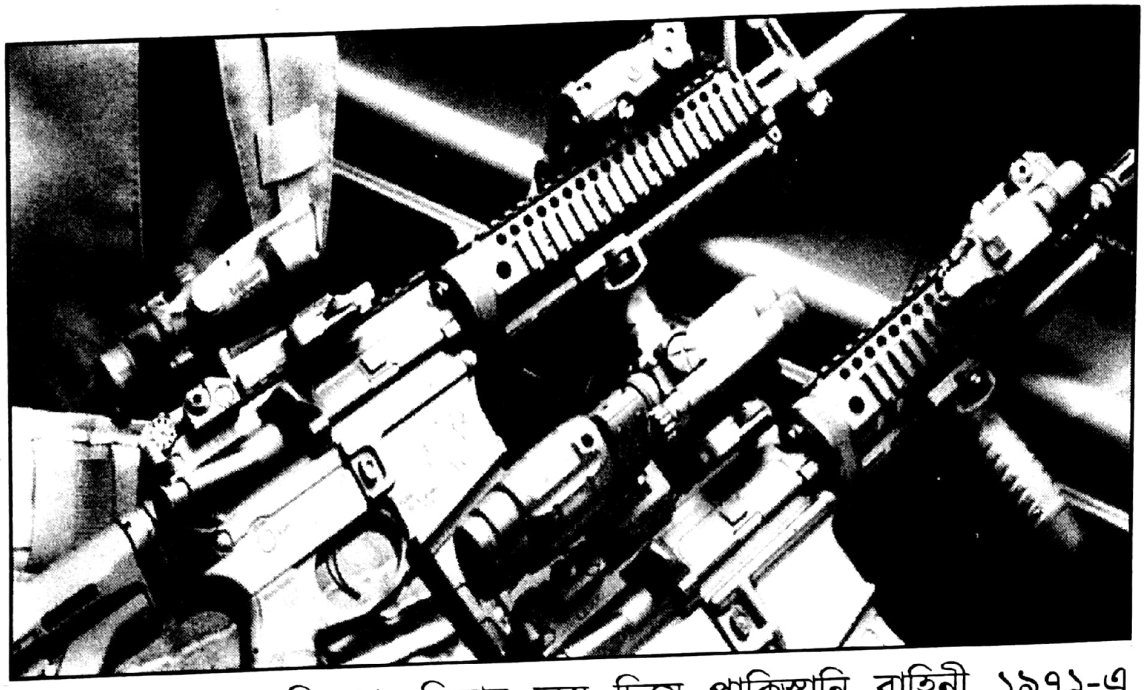

আমরা শুনে এসেছি আমেরিকান অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১-এ গণহত্যা চালিয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমেরিকান সরকারি দলিল কী বলে?

আমেরিকা থেকে পাকিস্তানের একটা বড় অস্ত্রের লট কেনার জন্যে নেগোশিয়েশন চলছিল। যে কয়টা পয়েন্টে কথাবার্তা চলছিল সেগুলো হচ্ছে :

১. বাকিতে কীভাবে দেয়া হবে
২. কত টাকা বাকি দেয়া হবে
৩. কী কী অস্ত্র দেয়া হবে?

আমেরিকার পজিশন ছিল, যেহেতু পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, তাই 'প্রাণঘাতী অস্ত্র' পাকিস্তানকে দেয়া যাবেনা। মুক্তিযুদ্ধের আগে এ বিষয়ে শেষ চিঠি দেখা যায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে, সেটা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১-এ লেখা। পাকিস্তানে অবস্থানরত আমেরিকান রাষ্ট্রদূতকে লেখা সেই চিঠি পড়ে বোঝা যায়, পাকিস্তান চাইছিল; আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ারকে 'নন লিথাল উইপন' হিসেবে বিবেচনা করতে; যেন পাকিস্তান আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার পায়। কিন্তু আমেরিকা এই আবদারে সাড়া না দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

আমেরিকা কর্তৃক পাকিস্তানকে কিছু প্লেন ও ৩০০ আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। যেখান থেকে শেষে আর্মার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ার বাদ দেয়া হয়।

২৫ মার্চের গণহত্যার পরে আমেরিকা এই নীতিতে স্থির থাকে, 'প্রাণঘাতী নয় এমন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ অব্যাহত রাখব।'[১,২] ফলে এটা ধরে নিতে অসুবিধা নেই আমেরিকা পাকিস্তানকে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোন প্রাণঘাতী অস্ত্র দেয়নি।

আদতে পাকিস্তানে অস্ত্র বেচা হবে নাকি ভারতে অস্ত্র বেচা হবে এই তর্ক আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টে শুরু হয় ১৯৬৯ সালেই। স্টেট ডিপার্টমেন্ট দক্ষিণ এশিয়াতে অস্ত্র সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে আমেরিকার পলিসি কী হবে সেই প্রসঙ্গে একটি পলিসি পেপারে বলতে চায়; ভারত পাকিস্তানের চেয়ে আমাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শুধু পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিলে ভারত অসন্তুষ্ট হতে পারে। এবং আমাদের ভারতের দিকে অস্ত্র ব্যবসার জন্যে ঝুঁকে থাকা উচিত, এতে আমরা দুই রাষ্ট্রকেই খুশি রাখতে পারব।[৩]

নিক্সন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই সুপারিশের সঙ্গে একমত হন না। তিনি বলেন, 'আমি ভারতের প্রতিক্রিয়ার কেয়ার করিনা।'

এমনকি ১৬ জুলাই ১৯৭১ কিসিঞ্জার বিস্ময়ের সঙ্গে আবিস্কার করেন, যে অস্ত্র সাহায্য পাকিস্তানকে দেয়ার কথা ছিল সেটা যায়নি। এমনকি এমন অবস্থা হয়েছে যে সেটাকে অস্ত্র সাহায্যের ওপর কমপ্লিট এমবার্গো বলা যায়। নিক্সন যা চেয়েছেন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঠিক তার উল্টোটা করেছে। কিসিঞ্জার বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'কখনো কখনো মনে হয় আমি একটা পাগলা গারদে আছি।'[৪]

সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা হচ্ছে, একটা অতি গোপনীয় গোয়েন্দা সভায় ৯ এপ্রিল ওয়াশিংটনে আলাপ হচ্ছে যে, সিআইএ প্রস্তাব দিচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীকে ক্ষুদ্র মারণাস্ত্র দেয়ার জন্যে।[৫] উল্লেখ করা যেতে পারে, ১১ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন তাজউদ্দীন। এর আগেই আমাদের যুদ্ধকে সিআইএ মুক্তিযুদ্ধ এবং প্রতিরোধ যোদ্ধা যারা তখনো সংগঠিত হয়নি তাদের মুক্তিযোদ্ধা সম্মোধন করে তাদের কাছে ক্ষুদ্র অস্ত্র দেয়ার কথা আলাপ হচ্ছে। মঈদুল হাসান তাঁর *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপরের* পৃষ্ঠা

১৩৪-এ এই সভার ডকুমেন্ট ছাপিয়ে পরের পৃষ্ঠায় কিছু প্রশ্ন রেখেছেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন ষাটের দশকে এস এস উবানকে সিআইএ রিক্রুট করে। এই উবান মুজিব বাহিনীর ট্রেইনার ছিলেন এবং এই উবানই রক্ষী বাহিনী গড়ার দায়িত্ব পান। এটা কি অনুমান করা যেতে পারে যে, এই অস্ত্রসাহায্য উবানের মাধ্যমেই এসেছে?

সূত্র

১. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, DEF 12–5 PAK. Secret; Exdis. Drafted on February 19 by Spengler; cleared by Van Hollen, Schneider, and Senior Regional Adviser James H. Boughton (NEA/RA), PM/MAS, and DOD/ISA; and approved by Sisco.

২. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, DEF 12–5 PAK. Secret; Immediate

৩. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–040, Review Group Meeting, South Asia Military Support Policy, 11/25/69 Secret

৪. International affairs 81, 5 (2005) 1097-1118 Page 1107

৫. National Security Council Files, 40 Committee, Minutes—1971. Secret; Sensitive.

৫

আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি আমেরিকার কাছে পাকিস্তানের সঙ্গে মধ্যস্থতার প্রস্তাব নিয়ে যান জুলাইয়ে

১ জুলাই ১৯৭১, আওয়ামী লীগ গণপরিষদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইউম কলকাতায় মার্কিন কূটনীতিকদের জানান, আওয়ামী লীগের নেতারা ঘটনাবলিতে উদ্বিগ্ন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে আগহী। কেননা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে এবং বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ প্রলম্বিত হলে উগ্রপন্থীরা তা দখল করে নেবে। এমনকি এইজন্যে আওয়ামী লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী থেকেও সরে আসতে প্রস্তুত।

এই রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে কাইউম প্রস্তাব দেন একটি চতুর্পক্ষীয় সভার যেখানে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান, আমেরিকা এবং ভারত থাকবে। কিন্তু তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের এই সভায় অংশ নেয়াটা আবশ্যিক। কাজী জহিরুল কাইউম নিজেকে আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি এবং তিনি প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী খন্দকার মুশতাকের কাছে থেকে সুনির্দিষ্ট বার্তা নিয়ে

এসেছেন বলে আমেরিকান কূটনীতিকদের জানান। কাজী জহুরুল কাইউমের নামের উল্লেখ সেই সময়ের ৮টি আমেরিকান ডকুমেন্টে আছে। এ থেকেই বোঝা যায়, কাজী কাইউমের প্রস্তাবগুলোকে আমেরিকা গুরুত্ব দিয়েছে, নিছক মুশতাকের কোনও ষড়যন্ত্র বলে উড়িয়ে দেয়নি। কারণ তার সকল প্রস্তাব ও আলোচনা যুক্তিপূর্ণ বলে আমেরিকানদের কাছে মনে হয়েছে। আমেরিকান কূটনীতিকরা নানাভাবেই তাঁর বক্তব্যকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তাঁর সঙ্গে দফার দফায় আলোচনা চালিয়ে গেছেন।

কাজী কাইউম আমেরিকার কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আসেন ৭ আগস্ট এবং দেখা করে পলিটিক্যাল অফিসারের কাছে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন, আমেরিকাই একমাত্র দেশ যারা এই অবস্থার একটা সফল নিষ্পত্তি করে দিতে পারে, কিন্তু এই নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অংশ হতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি আরও বলেন, যদি মুজিবুর রহমানকে বিচার করে ফাঁসি দেয়া হয় তবে সমঝোতার সম্ভাবনা হয়ে যাবে 'শূন্য'। আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের এমনকি বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্যদের জনগণের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই তারা কোনও সমঝোতায় পৌছানোর ক্ষমতা রাখে না। অন্যদিকে যদি এই সমঝোতা শেখ মুজিবের মাধ্যমে হয় তাহলে জনগণ এটা মেনে নেবে এমনকি ঠিক আগের অবস্থাতে ফিরে যাওয়া হলেও সেটাও জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

এর পরে কাজী কাইউম বলছেন, আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং এই উপমহাদেশের সবার জন্যে তা বিরাট বিপর্যয় হবে। কাইউম বলেন, গুজব শোনা যাচ্ছে যে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে কিছুদিনের মধ্যেই স্বীকৃতি দিতে পারে; এবং এর ফলে তিনি মনে করেন, ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব তাতে আরো গভীর হবে, রাজনৈতিক সমাধানের সম্ভাবনা সংকুচিত হবে এবং পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হবে। যদি যুদ্ধ শুরু হয় তবে আমেরিকার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিস্থিতির ওপরে নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে এবং এটা আওয়ামী লীগের জন্যে অসুবিধাজনক হবে।

জহিরুল কাইউমের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বক্তব্য পাকিস্তানি সরকারের কাছে পৌঁছানোর অনুমতি আমেরিকানদের কাজী কাইউম দেন। তিনি বলেন, ব্যক্তিগতভাবে নিজে পাকিস্তানে আলোচনা শুরুর জন্যে যেতে ইচ্ছুক এবং

খন্দকার মুশতাকও যেতে পারেন যদি নিরাপদ আচরণের নিশ্চয়তা দেয়া হয়।

খুব অবাক বিষয় যে, কাজী কাইউম আরো বলছেন, দিনে দিনে সামরিক শক্তি হিসেবে মুক্তিবাহিনী শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, তারা এই ক্ষেত্রে 'দুই ধারী' কৌশল নিয়েছেন। [কনভেনশনাল আর্মির যুদ্ধ ও মুক্তিবাহিনীর গোরিলা যুদ্ধ] দুই ডিভিশনের কনভেনশন্যাল ফোর্স, যা এখন আছে একটি ডিভিশন যাতে আছে দশটি ব্যাটেলিয়ন এবং একেকটি ব্যাটেলিয়নে আছে ১২০০ সেনা। যখন দ্বিতীয় ডিভিশনটি তৈরি হওয়া সম্পন্ন হবে তখন পূর্ব পাকিস্তান দখল করে তাকে রক্ষা করা হবে। আর এইসময়ের মধ্যে পাশাপাশি গেরিলা মুক্তিবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সকল অংশে গেরিলা তৎপরতা চালাবে।

তিনি বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে আওয়ামী লীগ নিঃসংশয় যে, সামরিক বিজয় তারা অর্জন করতে পারবে। এমনকি কাইউমের বক্তব্যে এটাও এসেছে যে, যুদ্ধের পরে বিপুল পুনর্গঠনের কাজ করতে হবে এবং এই কাজে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সাহায্য করতে পারে। ঠিক একই কথা যুদ্ধ শুরুর আগে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে।

এই ডকুমেন্টের কমেন্টে বলা আছে, মিলিটারি স্টান্ড পয়েন্টে মুক্তিবাহিনীর সামরিক বিজয় বিষয়ে তাঁকে (কাজী জহিরুল কাইউম) আরো বেশি দ্বিধাহীন মনে হয়েছে কিন্তু এসত্বেও রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে তিনি সমভাবে প্রণোদিত বলে মনে হয়েছে।

এই অবস্থানটা কাউকে বিহ্বল করে তুলতে পারে। যিনি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন মুক্তিবাহিনী শেষ বিচারে বিজয়ী হয়ে যাবে, তবুও ছাড় দিয়ে একটা রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা কেন চলছে? শুধুমাত্র সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে আওয়ামী লীগের জন্যে অসুবিধা সৃষ্টি করবে, সেটাই কি একমাত্র কারণ?

কাইউমের উদ্যোগটাকে মুশতাকের উদ্যোগ মনে করা যেতে পারে। আমেরিকান কূটনীতিকদের কাছেও তাই মনে হয়েছে। তবে এটা যে কাইউমের দিক থেকে ঘটনা পরিস্থিতিকে বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রস্তুতি বিষয়টা বাড়িয়ে চাড়িয়ে বলা বক্তব্য সন্দেহ নেই, আর সেটা স্বাভাবিকও। তবে মুশতাকের দিক থেকে বললে, তিনি হয়ত বলতেন, মুজিব যেন

পাকিস্তানীদের হাতে মারা না যান, তাকে যেন বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন এবং সর্বোপরি তাজউদ্দিন গংদের হাত ও প্রভাব থেকে পরিস্থিতিকে মুজিবের হাতে ন্যস্ত করতে পারেন–সেজন্যেই তিনি এই স্ট্রাটেজি নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বিশেষ শর্ত, 'কিন্তু এই নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় অংশ হতে হবে শেখ মুজিবুর রহমানকে' কেবল একথা বলার জন্যেই তাঁকে কোনও ষড়যন্ত্রকারী মনে করা কঠিন। আবার মুশতাকের এমন স্ট্র্যাটেজি নেয়া খুবই যুক্তিসিদ্ধ মনে করা যেতে পারে। তবে এমন ব্যাখ্যায় আস্থা রাখা না রাখা অথবা এমন পাঠে এগিয়ে আসা না আসা একেবারেই পাঠকের নিজস্ব বিবেচনার ওপর ছেড়ে রাখলাম।

সূত্র : National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL 23–9 PAK. Secret; Immediate; Exdis. Also sent to New Delhi

৬

বঙ্গবন্ধুর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমেরিকার রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন

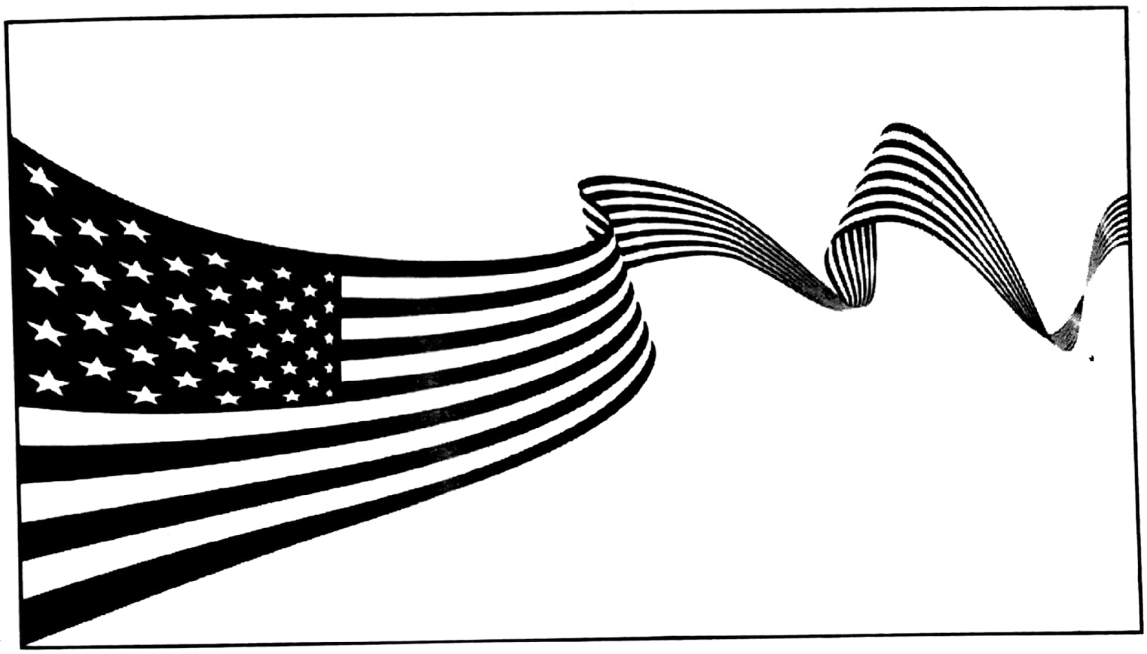

এই ডকুমেন্টটা ১১ আগস্ট ১৯৭১ সালের। অর্থাৎ এর ঠিক দুদিন আগে ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৫ বছরের প্রতিরক্ষা বিষয়ে বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। এই স্বাক্ষরের খবর আমেরিকানরা জেনে গেছে। কিন্তু তবু তারা নিশ্চিত না, বাংলাদেশের বিষয়ে (স্বাধীন করে ফেলা) ভারতের সিদ্ধান্ত কী হতে যাচ্ছে। যদিও পরবর্তীকালের সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ থেকে আমরা জানি, এই চুক্তি স্বাক্ষরই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে ভারতের সামরিক তৎপরতার সিগনাল ছিল।

এই দিনে পাকিস্তানের পরিস্থিতি ও সেখানে আমেরিকার করণীয় নিয়ে হোয়াইট হাউজের সিচুয়েশন রুমে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিক্সন, কিসিঞ্জার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সকল উপ ও প্রতিমন্ত্রী, সিআইএ'র উপ-প্রধান এক দীর্ঘ আলোচনা করেন।

নিক্সনের আলোচনার মূল বিষয় ছিল, যেন কোনও ভাবেই যুদ্ধ লেগে না যায়। এখানে যুদ্ধ বলতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বোঝানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত আমাদের

মুক্তিযুদ্ধের অপারেশনগুলোকে তারা গেরিলা হামলা বলেই অভিহিত করেছে। নিক্সন বারবারে বলছেন, যুদ্ধ লেগে গেলে এই অঞ্চলে আমেরিকার স্বার্থ দারুণভাবে বিঘ্নিত হবে। নিক্সন বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এবং ভারতে শরণার্থীরা যে দুরবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছে তাতে আমরা অত্যন্ত চিন্তিত। মানবিক সাহায্যের জন্যে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আহবান জানানো উচিত। আর আমাদের মানবিক সাহায্যে সর্বাত্মকভাবে ঝাপিয়ে পরা উচিত।

এখানে নিক্সন খুব বাজেভাবেই ভারতীয়দের সমালোচনা করেন। তিনি ভারতে কর্মরত আমেরিকান অফিসারদের সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করে বলেন :

> 'যে-ই দেখি ভারতে যায় সে-ই ওদের প্রেমে পড়ে যায়, বিষয়টা কী? পাকিস্তানে গেলেও কারো কারো এমন হয়। তবে ভারতের প্রেমেই পড়ে বেশি, কারণ পাকিস্তানিরা আবার আলাদা জাত। পাকিস্তানিরা সোজাসাপ্টা আর কখনও কখনও চূড়ান্তভাবে গর্দভ। আর ইন্ডিয়ানরা এমন কুটিল আর স্মার্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের ওদের মতো করে চিন্তা করতে বাধ্য করে।'

এই প্রসঙ্গটা এসেছে যখন নিক্সন আবিষ্কার করেন, স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে সামান্য প্রাণঘাতী নয় এমন যুদ্ধ সরঞ্জামের যে চালান পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল সেটা ডিপ্লোমাটরা আটকে দিয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নিক্সন নির্দেশ দেন, স্টেট ডিপার্টমেন্টে যে সব ভারতপ্রেমী আমেরিকান অফিসার আছে তাদের ঠাণ্ডা করতে হবে।

নিক্সন আশঙ্কা প্রকাশ করেন, যদি ভারত পাকিস্তানের ভেতরে গেরিলা পাঠিয়ে সীমান্তের আশেপাসে দৌড়ঝাঁপ করতে থাকে তাহলে সুইসাইডাল হবে সেটা জেনেও পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে পারে। আমরা জানি, নিক্সনের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। চার মাস পরে পাকিস্তানই প্রথম ভারতের মাটিতে আক্রমণ করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূচনা করে।

ঐ সভায় তিনটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল :

১. আমেরিকা শরণার্থী ও পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানুষদের জন্যে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা দেবে।

২. কোনও ভাবেই যেন যুদ্ধ না লাগে, কারণ যুদ্ধ কাউকেই সাহায্য করবে না।

৩. আমেরিকা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক (সমাধানের) অবস্থান নিয়ে কথা বলবে না। তবে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবে।

সভায় ধারণা করা হয়, সম্ভবত ভারত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এবং ভারতের লক্ষ্য যাই হোক না কেন, আমেরিকা কেয়ার করে না। আমেরিকা যেটা চায় তা হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়। পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার ভারতের নেই, ঠিক একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সুযোগ নেই পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের।

উপ-পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিস্কো এইসময় বলেন, আমাদের রাজনৈতিক সমাধানের প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, 'শেখ মুজিবকে যেন ফাঁসি দেয়া না হয়।' উল্লেখ করা যেতে পারে, তখন পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা চলছিল। নিক্সন তখন সাজেশন দেন, যেহেতু পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া এখনও বন্ধু বলে মনে করেন, শেখ মুজিবকে যেন মেরে না ফেলা হয়– সেটা যেন তার মাধ্যমেই ইয়াহিয়াকে জানানো হয়।

নিক্সন সভার শেষে আবারও বলেন, প্রকাশ্যে জনগণের কাছে আমরা বলব, আমরা এই সংঘাতের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমরা বলব শেখ মুজিবকে যেন মেরে না ফেলা হয়। নিক্সনের এই কথার মধ্যে দিয়ে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, আমেরিকা আর নিরপেক্ষ নয়; তারা একটা রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ফেলেছে। এবং শেখ মুজিবের জীবন বাঁচানোর জন্যে তাদের পদক্ষেপের কারণেই তারা নিজেরাও মনে করছে না তারা আর নিরপেক্ষতা দেখাতে পারছে। এই সভার তিন নম্বর সিদ্ধান্ত তাই ছিল : 'আমেরিকা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কথা বলবে না। রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলবে।'

আমরা এই সভার ডকুমেন্ট থেকেই জানতে পারি, বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্যে ইউ এন ১৭০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য সংগ্রহ করেছে যার মধ্যে ৭০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য এসেছে খোদ আমেরিকা থেকে।

সূত্র : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–058, SRG Meeting, Pakistan/Cyprus, 8/11/71. Secret; Nodis. Prepared by Saunders.

৭

খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে আমেরিকার সরাসরি কথা হয়নি

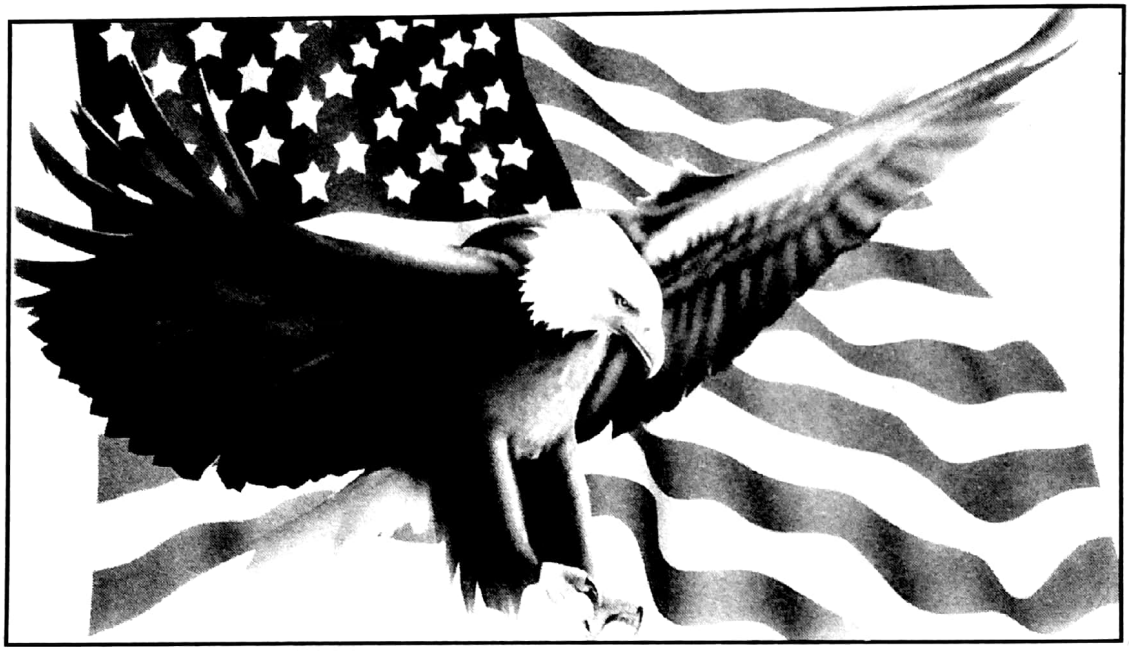

অবমুক্ত করা মোট পাঁচটি মার্কিন ডকুমেন্টে খন্দকার মুশতাকের নাম আছে। এই সবই শুরু হয়েছে কুমিল্লার আওয়ামী লীগ এমপি কাজী জহিরুল কাইউমের প্রস্তাব আমেরিকার কাছে উত্থাপনের পরে। ডকুমেন্টগুলো একে একে পড়লে বোঝা যায়, আমেরিকা চাইছিল খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে। কিন্তু খন্দকার মুশতাক সম্ভবত কোন অজানা কারণে আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে রাজি হননি। এবং খোন্দকার মুশতাক আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন অবমুক্ত করা ডকুমেন্টে সেটার কোনও প্রমাণ নাই।

কিন্তু কেন? কারণ অনুমান করে বলা যায়, তাঁর তৎপরতার খবর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের নাগালে যাতে আসে এমন কোনও প্রমাণ রাখতে চাননি,

তাই হয়ত এটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কাজী জহিরুল কাইউমের মধ্যস্থতা প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার পরেই খন্দকার মুশতাকের কথা আমেরিকান ডকুমেন্টে প্রথম দেখা যায়। পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ২৪ আগস্ট কাজী জহিরুল কাইউমের বক্তব্য নিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। ইয়াহিয়া কাজী জহিরুল কাইউমের প্রস্তাব ইতিবাচকভাবে ও উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেন। এমনকি ইয়াহিয়া ফারল্যান্ডকে এটাও বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। ইয়াহিয়া এটাও যুক্ত করেন, তিনি বুঝতে পারছেন না গণপরিষদ সদস্যরা ফিরে এসে এই পুনর্গঠনে হাত লাগাচ্ছেন না কেন? তাহলে তো তিনি শান্তিপূর্ণভাবে তাদের হাতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেন।

এই ডকুমেন্টেই খন্দকার মুশতাককে আমেরিকান ভিসা দেয়া হবে নাকি হবে না সেটা নিয়ে আলোচনা আছে। সম্ভবত আমেরিকায় গিয়ে খন্দকার মুশতাকের এই আপোস আলোচনা চালানোর কথা হয়েছিল। এবিষয়ে আমেরিকা সাফ জানিয়ে দেয়, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে খন্দকার মুশতাকের ভিসা দেয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হবে। এক্ষেত্রে আমেরিকা আপোস আলোচনার স্থান হিসেবে তৃতীয় আরেকটি দেশ যেমন যুক্তরাজ্যের কথা উল্লেখ করে।

ভারত ও স্বাধীনতা সম্পর্কে আমেরিকার খুব কৌতূহলউদ্দীপক বিশ্লেষণ আছে দুই লাইনের। সেখানে তারা বলছে : অন্তত কিছু বাংলাদেশী (রাজনৈতিক নেতা) মনে করছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু ভারতের স্বার্থই রক্ষা করবে; তাই স্বাধীনতা শব্দটা তাদের কাছে একটা মরিচীকার মতোই।[১]

ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট ৩১ আগস্ট পাকিস্তানে আমেরিকান দূতাবাসে নির্দেশনা পাঠায়। সেখানে কোলকাতায় খন্দকার মুশতাকের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া এই আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার আর কোনও উপায় নেই বলে জানানো হয়। তাদের এটাও মনে হয়, খন্দকার মুশতাক হয়তো ভারতেই নেই, তাই খন্দকার মুশতাক ঠিক কোথায় এখন আছেন সেটা খুঁজে বের করে স্টেট ডিপার্টমেন্টকে জানাতে বলা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী যার মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশ্যেই নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার কথা, আমেরিকান

ডকুমেন্ট দেখে মনে হচ্ছে, সেইসময় তিনি দৃশ্যত হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিলেন। কিন্তু ঠিক কোন কারণে এই সময়েই তিনি হাওয়া হয়েছিলেন সেটা হয়তো ভবিষ্যতে আমরা জানতে পারব। এই ডকুমেন্টেই পাঁচটি বিষয়ে বিশ্লেষণ ও মতামত জানানোর জন্যে নির্দেশনা দেয়া হয় :

১. বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য আপোস বিষয়ে

২. আপোস প্রস্তাবের কারণে মুক্তিবাহিনীর মধ্যে সম্ভাব্য বিভক্তি বিষয়ে

৩. স্বাধীনতার বদলে আপোস প্রস্তাবে ভারতের প্রতিক্রিয়া

৪. ইয়াহিয়া এই আপোস প্রস্তাব বিষয়ে ঠিক কী দিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ আর মিলিটারি অফিসারদের বুঝ দেবেন

৫. আপোষ আলোচনায় শেখ মুজিবের কেন্দ্রীয় ভুমিকার বিষয়ে বাংলাদেশের চাপাচাপিকে কীভাবে ইয়াহিয়ার মতলবের সঙ্গে মেলানো যায়। ইয়াহিয়া বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের জন্যে শেখ মুজিবকে 'বলির পাঠা' বানাতে চায়

এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমেরিকা ইয়াহিয়ার এই মতলব বুঝতে পেরেই সম্ভবত শেখ মুজিবের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মরিয়া প্রচেষ্টা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।[২]

কাজী জহিরুল কাইউম সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে আমেরিকাকে জানান, খন্দকার মুশতাক আমেরিকার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক নন। এই ডকুমেন্টেই উল্লেখ আছে তাজউদ্দিনও দেখা করবেন না। তার মানে তাজউদ্দিনের কাছেও আমেরিকার সঙ্গে আলাপ করার প্রস্তাব এসেছিল, যেটা তিনি গ্রহণ করেননি। তবে জানা যাচ্ছে, এই আলোচনা চালিয়ে নিতে এবং আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা করতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাজী আছেন। এই প্রেক্ষিতে, ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট কোলকাতার পলিটিক্যাল অফিসারকে সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেয়। এই ডকুমেন্টেই কাজী জহিরুল কাইউমের বরাতে জানতে পারি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারত সরকারের কাছে আমেরিকার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অনুমতি চেয়েছেন। সম্ভবত এই অনুমতি তিনি আর কখনো পাননি।[৩]

সূত্র

১. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL 23–9 PAK. Secret; Priority; Exdis. Repeated to Calcutta, Dacca, London, and New Delhi

২. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL 27 INDIA–PAK. Secret; Immediate; Nodis. Drafted by Constable (NEA/PAF) on August 25 and revised in the White House on August 30; cleared by Laingen, Schneider, and Atherton; and approved for transmission by Eliot. Also sent to Calcutta and repeated to New Delhi, London, and Dacca.

৩. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL 27 INDIA–PAK. Secret; Immediate; Nodis. Drafted by Constable; cleared by Laingen,Schneider, Van Hollen, Sisco, and Saunders; and approved by Irwin. Repeated to New Delhi, Islamabad, Dacca, and London.

৮

আমেরিকা একতরফা সেনা প্রত্যাহারে পাকিস্তানকে চাপ দেয়

৪ নভেম্বর ১৯৭১ ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা সফর করেন। এই সফরের পটভূমিতেই এই টেলিগ্রাম। এই সফরে শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও আপোস মীমাংসার কথা এগিয়ে দেয়া যায় কিনা সেই চেষ্টা ছিল নিক্সন প্রশাসনের। সেই লক্ষ্যেই নিক্সন সরাসরি ইয়াহিয়াকে একটা চিঠি লেখেন। সেই চিঠি পাকিস্তানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের হাত মারফত সম্ভবত ৩০ অক্টোবর ইয়াহিয়ার কাছে পৌঁছানো হয়। ইয়াহিয়ার কাছে নিক্সনের চিঠিতে যা লেখা ছিল সেটার বাইরেও ফারল্যান্ডকে স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা দীর্ঘ লিখিত নির্দেশনা দেয়া হয়। সেখানে ফারল্যান্ড কোন কোন পয়েন্ট নিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনা করবেন, তার অনুপুঙ্খ নির্দেশনা দেয়া হয়। ফারল্যান্ডকে লেখা স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেই নির্দেশনামূলক চিঠিটা একটা শিক্ষণীয় ম্যানেজমেন্ট পাঠ্য হতে পারে। নির্দেশনা এতো নিখুঁত হতে

পারে তা ওই চিঠির পুরোটা না পড়লে বুঝতে পারা মুশকিল। চিঠিতে আলোচনার লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়ে প্রথম পয়েন্টেই লেখা হয় :

> 'প্রেসিডেন্টের চিঠি হস্তান্তরের জন্যে আপনি সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে ইয়াহিয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন এবং নিচের বক্তব্যের বিষয়ে ইয়াহিয়ার বক্তব্য বের করে আনবেন, যেন মিসেস গান্ধীর ৪ নভেম্বরের সফরের আগেই আমাদের হাতে তাঁকে বলবার মতো প্রস্তাব হাতে এসে পৌছায়। আপনার আলোচনার সামগ্রিক লক্ষ্য হবে, পাকিস্তানিরা সর্বোচ্চ কী কী ছাড় দিতে প্রস্তুত সেটা জেনে নেয়া যাতে মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার সময়ে ভারতের তরফে পাল্টা উত্তেজনা প্রশমন করে এমন সব পদক্ষেপের বিষয়ে আহবান জানানো যায়।'

স্পষ্ট দুটি বিষয়ে ইয়াহিয়ার মতামত জানতে চাওয়া হবে :

১. একতরফা সেনা প্রত্যাহার

২. রাজনৈতিক সমাধান

রাজনৈতিক সমাধান কীভাবে ইয়াহিয়া করবেন সেটা তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেয়ার কথা বলা হয়। সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে আমেরিকা জানায়, তাদের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স থেকে তারা জানতে পেরেছে, পাকিস্তানই প্রথম সীমান্তের দিকে সেনা সঞ্চালন করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে খারিয়ান ক্যান্টনমেন্ট থেকে দুই ডিভিশন সেনা শিয়ালকোট সীমান্তে স্থিত করে। এরপরে অক্টোবরের প্রথম দিকে কয়েক ডিভিশন ভারতীয় সেনা শিয়ালকোটের পাকিস্তানের অবস্থানের বিপরীতে অবস্থান নেয়। আপনি মনে রাখবেন, সেনা প্রত্যাহারের বিষয়ে ইয়াহিয়া জাতিসংঘের (তৎকালীন) মহাসচিব উ থান্টের কাছে ইতিবাচক মত দেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের চিঠিতে ইয়াহিয়ার শেখ মুজিবকে 'ট্রাম্প কার্ড' হিসেবে ব্যবহারের ইচ্ছের কথা উল্লেখ আছে। সে বিষয়ে আমেরিকা জানায়, এই ব্যাপারটা তারা এখন ইয়াহিয়ার বিবেচনার উপরে ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা ঠিক আগের ডকুমেন্টের কথা জানি, যেখানে শেখ মুজিবের ওপরে সব দায় চাপিয়ে তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দেয়ার মতলব ইয়াহিয়া এঁটেছিলেন। ইয়াহিয়ার সেই ইচ্ছাটাকেই সম্ভবত এখানে 'ট্রাম্প কার্ড' হিসেবে বলা হচ্ছে।

বৃটিশ ইতিহাসবিদ তাঁর বই *ম্যাসাকারে* লেখেন, জুলাইয়ে ইয়াহিয়া তাঁর

জেনারেলদের বরাতে বলেন, জেনারেলরা তাঁর ওপরে চাপ দিচ্ছে যেন মুজিবের সামরিক ট্রাইবুন্যালে বিচার হয় এবং ফাঁসি দিয়ে দেয়া হয়। ইয়াহিয়া বলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত হয়েছি এবং বিচার শিগগিরই শুরু হবে। আগস্টের ২ তারিখে একটি প্রেসনোটে বলা হয়, মুজিব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তাই মিলিটারি কোর্টে তাঁর বিচার হবে।[১] সেদিনই ইয়াহিয়া একটি মিলিটারি কোর্ট গঠন করেন। ৩ তারিখে একটি টেলিভিশন ভাষণে ইয়াহিয়া বলেন মুজিবের বিচার হবে। ১১ আগস্ট থেকে বিচার শুরু হয় এবং ৪ ডিসেম্বর মিলিটারি কোর্ট শেখ মুজিবের ফাঁসির আদেশ দেয়।[২]

এই চিঠিতেই আমেরিকা উল্লেখ করে, ইয়াহিয়া যেন তাঁর মতলব অনুসারে মিলিটারি কোর্টের প্রসিডিংস প্রকাশ না করে; এটা করা হলে বাঙালিদের মনের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দেবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বিস্ফোরক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। আমেরিকা বলছে, শেখ মুজিব এখন একটা প্রধান প্রতীকে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা চায় যেন এই বিচারকাজ স্বচ্ছ হয় এবং আপীলের সুযোগকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সামলানো সহজ হবে।

এই দলিলগুলোর প্রতিটা পরতে পরতে তা পরামর্শ বা নির্দেশ যা-ই হোক– আমেরিকার দিক থেকে খুবই সতর্ক থাকতে দেখা গিয়েছে যে, তারা কোনও মধ্যস্থতাকারি অথবা ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতা– এমন যেন মনে না হয়। এমন ভূমিকা না নেয়া বা এভাবে ব্যাখ্যা করার কোনও সুযোগ যেন না থাকে সে ব্যাপারেও সতর্ক থেকেছে। তবে অনেক জায়গায় পাকিস্তানের কাছে বড় জোর কী কী অপশন আছে বা হতে পারে তার সবগুলো তুলে ধরা হয়েছে। তবে আমেরিকা সতর্ক থেকেছে যেন আমেরিকার কোনও অপশন পছন্দের এমন কোনও ঝোঁক বা ধারণা না দেয়া হয়। বরং পাকিস্তানের কাছে পরিস্কার থাকার চেষ্টা করেছে যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকেই একা নিতে হবে।

একটা খুব কৌতূহলউদ্দীপক মন্তব্য আছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্মরণ সিংকে উদ্ধৃত করে, স্মরণ সিং ৮ অক্টোবরে (১৯৭১) সিমলায় বলেন, 'ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকার ও তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তানের যেকোনও সমঝোতা মেনে নেবে এমনকি সেটা যদি পাকিস্তানের (সাংবিধানিক) কাঠামোর মধ্যেও হয়।'[৩]

সূত্র

1. Massacre: The Tragedy at Bangla Desh and the Phenomenon of Mass Slaughter Throughout History – February, 1973: by Robert Payne (Author)
2. Losers saw him as Trumpcard; Shakhwat Liton, The Daily Star, January 10, 2016
3. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL INDIA–PAK. Secret; Immediate; Exdis. Drafted by Laingen and Constable on October 29; cleared by Schneider, Van Hollen, Sisco, and Saunders; and approved by Irwin. Repeated to London, Moscow, New Delhi, Paris, Tehran, USUN, Calcutta, and Dacca. A note for the record, attached by Saunders on October 29 to a draft of the telegram, indicates that Kissinger revised and cleared it. (Ibid., Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 626, Country Files, Middle East, Pakistan, Vol. VII, Sep–Oct 1971)

৯

আইয়ুব-ইয়াহিয়া অনেক আগেই বুঝে যায় পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তান আলাদা হতে যাচ্ছে

আমরা আগেই দেখেছি, আমেরিকা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই বুঝে গিয়েছিল, বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে যাচ্ছে। আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও একই ধারণা দিয়েছিল। ১৯৭০-এর নির্বাচন হয় ৭ ডিসেম্বর। নির্বাচনের পুরো ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার আগেই ৮ ডিসেম্বর ১৯৭০, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টেলিজেন্স ও রিসার্চের প্রধান রে ক্লাইন কিসিঞ্জারের কাছে একটা বার্তা পাঠান। সেখানে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব 'ভূমিধ্বস বিজয়' অর্জন করতে যাচ্ছেন ও ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছেন। এই কারণেই পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে এক বিন্দুতে নিয়ে আসা এই ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট 'তখনও সম্ভব' মনে করছে। রে ক্লাইন মূলত ভুট্টোকে ইঙ্গিত করে বলেন, মধ্যপন্থী হিসেবে ভুট্টোর সুখ্যাতির কারণেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে

সমঝোতার সম্ভাবনা সমস্যাসঙ্কুল। আওয়ামী লীগের চাওয়া মতো সংবিধানে পূর্ব পাকিস্তানকে পর্যাপ্ত স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা না গেলে বাঙালিরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেষ্টা করবে।

তবে এই রিপোর্টে এক গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন আছে। যেটা ভবিষ্যতে যে কোনও গবেষকের জন্যে কাজে লাগতে পারে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রের গাঠনিক বৈশিষ্ট অথবা সমস্যা পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাকিস্তান নিয়ে রাষ্ট্র গড়ার বিষয়ে আলোচনার সুযোগ একবারই এসেছিল বা হয়েছিল। সেটা হলো ১৯৬৯-৭০ সালের 'গোলটেবিল' আলোচনায়। যার আউটকাম হলো গৃহীত দলিল 'লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার' বা এলএফও। এই দলিলের পিছনে ধরে নেয়া কী অনুমান কাজ করেছিল সে সম্পর্কে এই গোয়েন্দা রিপোর্টে এক মন্তব্য আছে। তা হলো :

> 'স্বায়ত্বশাসন প্রশ্নে যে-কোনও সিদ্ধান্তের মূল চাবি ইয়াহিয়ার হাতে। ধরে নেয়া হচ্ছে, তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে কাজ করার গুরুত্বকে বুঝেছেন, কিন্তু তিনি সন্দেহাতীতভাবে এটাও বিশ্বাস করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট শাসকেরা যথাযথভাবে মধ্যপন্থীদের (পিপিপি) দিয়ে প্রতিনিধিত্ব পাবে এবং তারাই আওয়ামীলীগের নেতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। আর এভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষিত হবে।'[১]

এটা থেকে প্রতীয়মান, পাকিস্তানের কেউই নিশ্চিত ছিল না পূর্ব-পশ্চিম মিলে একটা রাষ্ট্র গড়ার ক্ষেত্রে প্রধান ইস্যু কী, যেদিকে নজর দিতে হবে। শেষ বাক্যটা লক্ষ্য করা যেতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের 'সেন্টারিস্টি' চিন্তার রাজনীতিবিদেরা মনে করেছিল তারা আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে কাজ করতে পারবে ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং এভাবেই তারা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে।

জানুয়ারি ২৯, ১৯৭১ ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। সেই আলোচনার সারমর্ম তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে পাঠান। আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান পূর্ণ অনুবাদ পাঠকদের জন্যে দেয়া হচ্ছে। এখানে ইয়াহিয়া বাংলাদেশের সম্ভাব্য স্বাধীনতার কথা বলছেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতিতে কী কী প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। ইয়াহিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা যত নেতিবাচক

হোক না কেন, এই আলোচনায় ইয়াহিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষণ ও গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। ফারল্যান্ড লিখছেন :

১. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপের সময় তিনি পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে ভীষণ ভীতি প্রকাশ করলেন। তিনি বলেন, এই ঘটনা তাঁর কাছে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। বর্তমানে সংবিধান প্রণয়নের যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেখান থেকেই এই সমস্যা তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, তিনি কীভাবে একটি সংবিধানকে তাঁর অফিসিয়াল অনুমোদন দেন যার মধ্যে সহজাতভাবে এমন উপাদান আছে যা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে; একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ আমাদের জাতীয় লক্ষ্য যা আমারও স্বপ্ন ছিল। তিনি আইয়ুব খানের কথাই তাঁর ভাষ্যে বলেন, (আইয়ুব খান) বলেছিলেন, তিনি পাকিস্তান ভাঙ্গার অনুষ্ঠানের পৌরিহিত্য করতে চান নাই।

২. আমি এটা মনে করিয়ে দিলাম, আমার প্রথম বৈঠকেই বলেছিলাম, আমেরিকার পলিসি হচ্ছে, পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, এবং আমি এই নীতির কথা একাধিকবার নানা প্রসঙ্গে প্রকাশ্যেই বলেছি। এছাড়াও আমি বললাম, যারা এর উল্টো ধারণা পোষণ করে তারা আমেরিকার স্বার্থের বন্ধু নয়; এর উল্টো যারা বলে যে আমেরিকা পাকিস্তানের দুই অংশেকে বিচ্ছিন্ন করতে মদদ দিচ্ছে তারা শুধু মিথ্যাই বলছে না, ববং এই প্রচার রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান যাদের আছে তারা বলতে পারে না। এছাড়াও, যারা এটা বিশ্বাস করে আমেরিকা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আরেকটা অনুন্নত রাষ্ট্র তৈরি হোক সেই ইচ্ছে পোষণ করে। এটা হাস্যকর কিনা তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই ধরনের বিষয়কে সংবাদমাধ্যমে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সেটা বিশ্বাসও করা হচ্ছে।

৩. ইয়াহিয়া বলেন, তিনি অবশ্যই আমেরিকার এই নীতিকে পুনর্বার ব্যক্ত করাকে সাধুবাদ জানান যেহেতু পাকিস্তান সরকার ঠিক এর উল্টো কথাই নানা রিপোর্টে শুনছে এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ে এই নিয়ে অস্বস্তি

আছে। তিনি বলেন, তাঁর সাধ্যমত সবকিছুই করবেন যেন পাকিস্তানের দুই অংশ এক সঙ্গে থাকে। কারণ এটা না থাকলে, ভারত এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে পাকিস্তানকে যেই বিপদ মোকাবেলা করতে হতে পারে তা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

১৯৬৫ সালে শিয়ালকোটে সামরিক স্ট্র্যাটেজি ঠিক করছেন আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান। সঙ্গে আছেন জেনারেল মুসা আর এয়ার মার্শাল আসগর খান

৪. তিনি কী কী বিপদ দেখছেন তা জানার জন্যে, আমার অনুরোধের প্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া বলেন, যে ম্যাপ ভালো করে দেখেছে এবং মিলিটারি কৌশল সম্পর্কে অবগত আছে বা এই অঞ্চলে চীনের নেতা হওয়ার আকাঙ্খার কথা জানে সে খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তান একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট হয়ে উঠবে। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ব বাংলা)-কে কেন্দ্র করে চীন খুব সহজেই গায়ে গায়ে লাগানো অন্যান্য ভূখণ্ডগুলো টেনে নিতে শুরু করবে; চীনের জন্যে এটা খুব সহজ রাজনৈতিক চাল হবে যে আসাম, পশ্চিমবঙ্গকে একসঙ্গে টেনে নেয়া। এমনকি, তিনি বলেন, এমন একটা সুযোগের জন্যে ভাসানীর অনুসারীরা চির কৃতজ্ঞ থাকবে।

৫. ইয়াহিয়া তাঁর এই মতকে আরো গুরুত্ব দেয়ার জন্যে বললেন, 'এটা ঘটলে (বাংলাদেশ স্বাধীন হলে) জঘন্য চীনারা যা এতদিন চেয়ে আসছিল তা পেয়ে যাবে সহজেই। আর তা হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে একটি বন্দর, যা দিয়ে ভারত মহাসাগরে সে ঢুকতে পারবে।' ইয়াহিয়া বলতে থাকলেন, এটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যার মধ্যে বার্মাও আছে সেই এলাকায় চীনের চোরের ওপর বাটপারি করার সুযোগ তৈরি করে দেবে; এই অঞ্চল তার জন্যে হবে এক 'পাকা আমের মতো'। এমনকি থাইল্যান্ডও এই বলয়ে আসার জন্যে তখন উপায় খুঁজবে। ইয়াহিয়া এই বলে উপসংহার টানেন, 'যদি আপনারা মনে করে থাকেন যে আপনারা ভিয়েতনামে জগাখিচুড়ি করে ফেলেছেন, তাহলে ভাবুন এই পুরো অঞ্চল যদি চীনের প্রভাব বলয়ে আসে তাহলে কী হবে?'

৬. আমি পাকিস্তানের দুই অংশের বিচ্ছিন্নতার ফলে কী হতে পারে সে বিষয়ে ইয়াহিয়ার খোলামেলা ও অকপট বিশ্লেষণের জন্যে সাধুবাদ জানালাম। আমি নিজেও একটি নতুন 'স্বাধীন রাষ্ট্র' চীনের জন্যে কী সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে সেবিষয়ে জানলাম। যদিও আমি যুক্ত করলাম, পিকিং-এ কী হচ্ছে সেবিষয়ে আমি জানতাম না তাই আপনার এই আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে শুনেছি।[২]

মূল ভাষ্যের অনুবাদ শেষ। এখানে ইয়াহিয়ার প্রথম পয়েন্ট প্রসঙ্গে আমার নিজের একটা মন্তব্য করছি। ইয়াহিয়া বলছেন, 'তিনি বলেন, তিনি কীভাবে একটি সংবিধানকে তাঁর অফিসিয়াল অনুমোদন দেন যার মধ্যে সহজাতভাবে এমন উপাদান আছে যা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে; একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ আমাদের জাতীয় লক্ষ্য যা আমারও স্বপ্ন ছিল'। এ কথাগুলো পড়তে হবে ২৫ মার্চ একাত্তরে কেন তিনি ম্যাসাকার করেছিলেন এর সপক্ষের সাফাই হিসাবে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন, যে কনস্টিটুশন তৈরি করা মানে দুই পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়া তিনি সেটা অনুমোদন দিতে পারেন না। আর এই 'পারেন না' বলেই ইয়াহিয়ার করণীয় হয়ে যায় বলপ্রয়োগ। গণহত্যা করে হলেও দুই পাকিস্তান ধরে রাখার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাওয়া। এর মানে আমরা দেখছি ইয়াহিয়া আসলে ব্যস্ত কী করলে পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাওয়া ঠেকবে

সেটা তিনি জানেন না, বলতে পারছেন না। তিনি বরং ব্যস্ত সেপারেশনের পরিস্থিতি হলে কিভাবে দমন করবেন সেটা আমেরিকাকে বোঝাতে।

বঙ্গোপসাগরে চীনা বন্দরের বিষয়টা আমেরিকার উদ্বেগের কারণ হতে পারত কিন্তু আমেরিকা এই ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত এই কারণেই যে, তারা জানে শেখ মুজিবুর রহমান চীনবিরোধী ও আমেরিকার বন্ধু।[৩]

সূত্র

১. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL 14 PAK. Confidential. No drafting information appears on the intelligence brief.

২. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL PAK. Secret; Exdis; Eyes Only for Assistant Secretary Sisco. In telegram 930 from Islamabad, February 1, Farland reported that he had met with President Yahya on January 29 in Yahya's home to "talk about things in general." (Ibid., POL 15–1 PAK)

৩. National Archives, RG 59, Central Files 1970–73, POL PAK–US. Confidential; Priority; Limdis. Repeated to Islamabad, Karachi, and Lahore.

১০

কিসিঞ্জার জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে বাংলাদেশ সমস্যায় যুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন

২২ নভেম্বর ১৯৭১। ওয়াশিংটনে কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে মার্কিন সরকারের একটি বিশেষ সভা হয়। সভার নাম ছিল 'স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ মিটিং'। সেই সভায় সিআইয়ের ব্রিগেডিয়ার কুশম্যান সবাইকে বাংলাদেশ পরিস্থিতির একটা ব্রিফ দেন। তিনি জানান, ভারত দুই ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন ও আর্মার্ড বাহিনীসহ যশোর সীমান্তে আক্রমণ শুরু করেছে। ভারত তার আক্রমণ আর সৈন্য সমাবেশের মাত্রা বাড়াচ্ছে। ইয়াহিয়া কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হতে চান না, কারণ তিনি জানেন, জিততে পারবেন না। কিন্তু হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হবেন।[১]

এই সভায় পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের সঙ্গে ইয়াহিয়ার আলোচনার ভিত্তিতে পাঠানো ১৯ নভেম্বরের তারবার্তার বিষয়েও আলোচনা

হয়। ১৯ তারিখের তারবার্তায় ফারল্যান্ড জানান, ইয়াহিয়া ২৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের সভা ডাকবেন এবং এর দুই সপ্তাহের মধ্যে বেসামরিক প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াবেন, সেটাও সেদিন তিনি ফারল্যান্ডকে জানান। তবে ইয়াহিয়া শেখ মুজিব বা তাঁর মনোনীত কারো সঙ্গে রাজনৈতিক ফয়সালার সম্ভাবনা নাকচ করে দেন। তার মানে হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, পরবর্তীকালে ১৬ ডিসেম্বর যদি পাকিস্তান আর্মি সারেন্ডার না করতও, ওদিকে ইয়াহিয়াসহ পুরা আর্মি ভুট্টোর হাতে সব তুলে দিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে পালানোর একটা পরিকল্পনা এঁটে ছিল। সেদিন ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া এটাও পুনর্বার নিশ্চিত করে বলেন, তিনি ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবেন না। ফারল্যান্ড এখানে নিজের মত যুক্ত করে বলেন, আমরা একজন সামরিক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছি, যিনি এক ধরনের পূর্বনির্ধারিত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন। তাই ইন্দিরা গান্ধীকে এই বলে সতর্ক করে দেয়া উচিত তিনি যেন তাঁর জেনারেলদের পাকিস্তানের টেরিটরিতে আক্রমণ বন্ধ করতে বলেন; না হলে এক বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।[২]

মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক ফয়সালার বিষয়ে ইয়াহিয়ার অনীহায় আমেরিকান সরকার হতাশ হয়। এই সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইরুইন সেই হতাশার কথা ব্যক্ত করেন। ইরুইন এই সভায় প্রস্তাব করেন, আমেরিকা যেন ইয়াহিয়ার উপরে মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক ফয়সালায় জন্যে চাপ প্রয়োগ করে। সভায় প্রস্তাব আসে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে বাংলাদেশ ইস্যুতে যুক্ত করতে হবে, যেন এই ইস্যুতে ডায়ালগ শুরু করা যায়। প্রস্তাবটা কিসিঞ্জারের তরফ থেকে নয়। কিসিঞ্জার জানতে চান, কার কার মধ্যে ডায়ালগ হবে? এর উত্তরে স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিসকো বলেন, সেটা একটা জটিল সমস্যা, ভারত চাইবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সংলাপ হোক এবং ভারত যেন এই সংলাপের অংশ না হয়। এবং জাতিসংঘ পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মধ্যস্ততা করার অর্থই হচ্ছে এই দুই অংশ আর একসঙ্গে থাকছে না সেই মেনে নেয়া। কিসিঞ্জারের আপত্তি ছিল অন্য জায়গায়। কিসিঞ্জার খুব সাফ জানিয়ে দেন, নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ সদস্যের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের পক্ষে ভোট দেবে আর চীন পাকিস্তানের

পক্ষে ভোট দেবে। আর আমরা তখন শুধু ভারত আর পাকিস্তানের গ্যাঁড়াকলেই পড়ব না, তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমরা চীন আর সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝখানে পড়ে যাব। এই স্পর্শকাতর অবস্থার মধ্যে আমেরিকার পড়া উচিত নয়। তাই এই মুহূর্তে নিরাপত্তা পরিষদে যাওয়ার বিকল্প আমেরিকার জন্যে মোটেও সুবিধাজনক নয়।[৩]

সূত্র

১. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–082, Senior WSAG Meeting, South Asia, 11/22/71

২. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 643, Country Files, Middle East, India/Pakistan, July 1971. Secret; Sensitive; Eyes Only. The text of this message was conveyed to Haig in a November 19 memorandum. (Ibid.)

৩. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–115, WSAG Minutes, Originals, 1971. Top Secret; Sensitive. The meeting was held in the White House Situation Room. No drafting information appears on the minutes. A briefer record of this meeting, prepared by James Noyes (OASD/ISA), is in the Washington National Records Center, OSD Files, FRC 330 76 0197, Box 74, Pakistan 381 (Jan–Nov) 1971.

১১

বাংলাদেশ নিয়ে সোভিয়েত-মার্কিন প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব

৩ ডিসেম্বর ১৯৭১, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে যায়। পশ্চিমা ঐতিহাসিকেরা এই বিষয়ে কমবেশি একমত যে, ভারতের মাটিতে আক্রমণ করার জন্যে ভারতই পাকিস্তানকে উস্কানি দিয়েছিল, আর পাকিস্তান বোকার মতো সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল।[১]

জে এন দীক্ষিত তাঁর *ইণ্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান* বইয়ে এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'এই গর্দভ (ইয়াহিয়া) তা-ই করেছেন যা আমরা চেয়েছিলাম।' (পৃ. ২০৯)

আমেরিকা ৪ ডিসেম্বরে এই সংঘাতের বিষয়টা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে নিয়ে যায়, সেখানে ১১ বনাম দুই ভোটে আমেরিকার আনা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ভেটো দেয়, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভোটদানে বিরত থাকে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন এই দুই ন্যাটো এলাই ভোটদানে বিরত থাকা প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার বলেছিলেন, আমাদের ও রাশিয়ার মাঝখানে তারা নিজেদের

পজিশন নেয়ার চেষ্টা করেছে আর ভেবেছে, প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে রাশিয়া উন্মাদ হয়ে যাবে। কিসিঞ্জারের মতে, আমেরিকান কূটনীতিতে সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল বৃটেনকে এইদিকে ঠেলে দেয়া।[১]

৫ ডিসেম্বর কিসিঞ্জার আমেরিকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ইউরি ভোরন্তসভকে ডেকে পাঠান। বিকাল চারটার তিনি কিসিঞ্জারের দফতরে আসেন। কিসিঞ্জার নিক্সনের বরাতে বলেন, নিক্সন চান তাঁর বার্তা লিওনিদ ব্রেজনেভকে যেন পৌছে দেয়া হয়। নিক্সনের বার্তার মূল বিষয় ছিল, তিনি বুঝতে পারছেন না, যখন সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে দুই দেশের সার্বিক সম্পর্ক উন্নত হচ্ছে তখন কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতীয় আগ্রাসনকে সমর্থন করে। আমরা (আমেরিকা) কখনোই এমন অবস্থান নিইনি যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরে পরিস্থিতি বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে বদলাবে, বরং আমরা (আমেরিকা) সবসময় একটি রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজেছি।. আমরা বুঝিনা কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এমন পজিশন নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের কাছে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা চায়, শারম আল শেখে নিরাপত্তা পরিষদের উপস্থিতি চায় আবার একইসঙ্গে নিউ ইয়র্কে এসে নিরাপত্তা পরিষদকে নপুংসক বলে। আমরা বুঝিনা কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন একাধারে মনে করে কোনও পরাশক্তিই বিশেষ সুবিধার (সামরিক) অধিকারি হতে পারবে না, আবার একইসঙ্গে উপমহাদেশে যুদ্ধ বাধানোতে হাওয়া দেয়।

নিক্সন তাঁর হতাশা ব্যক্ত করেন। তবে তারপরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে বিনীত অনুরোধ করেন যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা একসঙ্গে উপমহাদেশে যুদ্ধ বন্ধ করতে ভূমিকা নেয়।

ভোরন্তসভক এই পর্যায়ে বলে উঠেন, আমাদের সম্পর্ক আগের মতো উষ্ণই আছে। কিসিঞ্জার সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা বলে উঠেন, এই প্রসঙ্গে আমার বলে রাখা উচিত, ভিয়েতনামে যা ঘটছে তাতে আমাদের মধ্যে মারাত্মক সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ভোরন্তসভক কিসিঞ্জারের কাছে জানতে চান, রাজনৈতিক সমাধান বলতে আমেরিকা আসলে কী চাইছে? কিসিঞ্জার বলেন, আগে যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহার, তারপরে ইয়াহিয়ার বেসামরিক প্রশাসনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। ইয়াহিয়া ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী আছেন।

ভোরন্তসভক এইসময় বলেন, 'এক সপ্তাহের মধ্যেই পুরো বিষয়টা শেষ হয়ে যাবে।'

কিসিঞ্জার উত্তর দেন, এক সপ্তাহে এটা শেষ হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে কীভাবে এটা শেষ হয় তার উপরে।

ওই দিন বিকেল ৪টা ৫৫ মিনিটেই কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে ফোন করেন। এর মধ্যে কিসিঞ্জার নিক্সনের সঙ্গে কথা বলে নেন। তিনি সোভিয়েত দুতকে তাঁর আগের কথার সুত্রে বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন মনে করেন, এক সপ্তাহের মধ্যে এটা শেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা (আমেরিকা) এর সঙ্গে যুক্ত আছি এবং ঘটনাবলী যদি বর্তমান ধারাতেই চলতে থাকে। নিক্সনের বরাতে কিসিঞ্জার বলেন, সোভিয়েত দূত যেন ব্রেজনেভকে এটা বলেন, আমেরিকা আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে।[২,৩]

সূত্র

১. Review Article: Nixon, Kissinger and breakup of Pakistan, 1971; Geoffery Warner; International Affairs 81, 5 (2005) pp 1111

২. Library of Congress, Manuscript Division, Kissinger Papers, Box 370, Telephone Conversations, Chronological File, 1-5 December 1971. No classification marking.

৩. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 492, President's Trip Files, Dobrynin/Kissinger, 1971, Vol. 8. Top Secret; Sensitive; Exclusively Eyes Only. Drafted by Kissinger.

১২

বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতিতে আমেরিকান প্রতিক্রিয়া

৬ ডিসেম্বর যেদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, সেদিন হোয়াইট হাউজে ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সভা ছিল। সেই সভায় নিক্সন সভাপতিত্ব করেন। সভার শুরুতেই সেক্রেটারি অব স্টেইট রজার্স বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্রিফ দেন। এই ব্রিফে আমেরিকা এই পর্যন্ত যে যে পলিসি নিয়ে কাজ করেছে তার একটা চমৎকার সারাংশ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক সমস্যার দায় আমেরিকার নয়। এটা একটা দীর্ঘসময়ের পুঞ্জিভূত শত্রুতার কারণে স্থানীয় সমস্যা। আমেরিকা চায় এই সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার আগে প্রেসিডেন্ট নিক্সন আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমরা ঐকান্তিক কূটনীতির একটা পর্ব শুরু করি, সেকারণেই আমরা মানবিক সাহায্য পাঠানোর দিকে গুরুত্ব দিয়েছি। একক দেশ হিসেবে আমরা

অন্য সব দেশের সম্মিলিত সাহায্যের চেয়ে বেশি মানবিক সাহায্য প্রেরণ করেছি। কোন দেশই যেন অস্ত্র সাহায্য না পায় সেই চেষ্টা করেছি। এমনকি সম্প্রতি আমরা কংগ্রেসে আরো ২৫০ মিলিয়ন ডলারের মানবিক সাহায্য দেয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। আমেরিকার তরফ থেকে যা যা করা দরকার আমরা সেসব কিছুই করেছি। আমেরিকাকে এই অবনতিশীল পরিস্থিতির জন্যে কোনভাবেই দোষারোপ করা যায় না। এক্‌মাত্র ওই এলাকার জনগণই এই উদ্ভুত সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমেরিকার এখন এই সমস্যার মধ্যে সম্পৃক্ত না হয়ে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের দিকে নজর কেন্দ্রিভুত করা উচিত। প্রেসিডেন্ট এরমধ্যেই জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থপন করেছিলেন, ১১টি দেশ ইউএনের আমেরিকা কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করেছিল, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন আর পোল্যান্ড তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপরে ছোট কয়েকটি দেশ যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব উত্থাপন করে, তা-ও সোভিয়েত ভেটোতে ভেস্তে যায়। এখন সাধারণ পরিষদে একই প্রস্তাব উত্থাপনের প্রক্রিয়াতে আছে। এক কথায় আমরা এই সংকটে মানবিক সাহায্য দিয়েছি আর শান্তিপূর্ণ সমাধান চেয়েছি।

তখন নিক্সন বলেন, আমি ইয়াহিয়া ও শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছি, এমনকি শ্রীমতী গান্ধী যখন এখানে এসেছিলেন তখনও কথা বলেছি যে ইয়াহিয়া সীমান্ত থেকে একতরফা সৈন্য প্রত্যাহার করবেন যদি ভারত থেকে তারা কিছু ইতিবাচক সাড়া পায়। এমনকি ইয়াহিয়া এটাও বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের কিছু নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে রাজী আছেন। কিন্তু এইসব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

সেক্রেটারি রজার্স জোর দিয়ে বলেন, এই সমস্যা স্থানীয়, তা স্থানীয়ভাবেই ফয়সালা হওয়া শ্রেয়। আমেরিকা আগে এইরকম স্থানীয় সমস্যায় মাত্রাতিরিক্ত বেশি যুক্ত হয়ে পড়েছিল।

এই প্রসঙ্গে নিক্সন নাইজেরিয়ার উদাহরণ টানেন এই বলে যে, সেইসময় যখন আমেরিকা সাহায্য করতে গিয়েছিল কিন্তু পরিণতির উপরে আমেরিকার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিলনা। এই ক্ষেত্রেও আমরা এই সময়ে ভারতকে ১০

বিলিয়ন ডলার* সাহায্য দিয়েছি, কিন্তু তার কোনও প্রভাব ভারত সরকারের ওপরে পড়েছে বলে দৃশ্যত মনে হচ্ছে না।

পক্ষান্তরে আমরা পাকিস্তানের সামরিক সাহায্য বন্ধ করেছি; যার কারণেই ভারতের পাকিস্তানে আক্রমণ করা সহজতর হয়েছে। আমেরিকার এই ভারত-পাকিস্তান সমস্যায় আমেরিকার কিছু সুনির্দিষ্ট সমস্যা আছে, নিক্সন বলেন। ভারত এই সংকট থেকে দূরে থাকতে চাচ্ছে না। বরং এই সংকটে নিজেকে

৪ নভেম্বর ১৯৭১, হোয়াইট হাউজের সাউথ লনের ব্যালকনিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

উৎসাহের সঙ্গে যুক্ত করছে। এখন পশ্চিম পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করেছে। এখন পাকিস্তানকে এই আক্রমণের জন্যে দোষ দেয়া হবে। ফিনল্যান্ড যদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করত, সেক্ষেত্রে ফিনল্যান্ডকে দোষ দেয়ার মতো। আর এদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন লাগামহীনভাবে ভারতকে সাহায্য করেই যাচ্ছে। যদি কোথাও আন্তর্জাতিক সমস্যা হয়, তখন

---

* (মূল ডকুমেন্টে দশ বিলিয়ন ডলারের কথাই উল্লেখ করা আছে, এই ফিগারটা যেহেতু কথোপকথনের সময়ে এসেছে, তাই স্লিপ অব টাং হতেও পারে। কারণ সাহায্য কখনোই এতো বড় মাপের হয় না– গ্রন্থকারের নোট)

প্রচার হয়, এটা আমেরিকার কারণে হয়েছে, কিন্তু স্থানীয় শত্রুতা এত তীব্র যে রাজনৈতিক সমাধানের কোনও চেষ্টাই কাজে আসেনি।

এখানে নিক্সন হতাশার সুরে বলেন, আমরা যদি সামরিক শক্তির একটা ভারসাম্য রাখতে পারতাম তাহলে শান্তি অর্জন সহজতর হতো। যেহেতু আমরা সেটা রাখতে পারিনি তাই দক্ষিণ এশিয়াতে আমেরিকান নীতি ব্যর্থ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। ভারত দীর্ঘদিন থেকে পাকিস্তানের ক্ষতি করার চেষ্টা করে এসেছে। পূর্ব পাকিস্তান ভারতের লক্ষ্য নয়, ভারতের লক্ষ্য কাশ্মীর। আমরা মনে করেছি সামরিক সাহায্য কমালে যুদ্ধের সম্ভাবনা তিরোহিত হবে, এটা একটা মারাত্মক ভুল ধারণা।

সিআইএ'র ডিরেক্টর রিচার্ড হেল্ম বলেন, ভারতের পশ্চিম পাকিস্তানে কোনও সামরিক লক্ষ্য নেই। তারা কাশ্মীরকে সুরক্ষিত রেখে পূর্ব পাকিস্তানকে দ্রুত মুক্ত করতে চায়। তারা এক সপ্তাহ থেকে দশ দিনের মধ্যেই এই কাজটা করে ফেলবে।

এই আলাপটা হচ্ছে ৬ ডিসেম্বর, এবং সিআইএ কী নিখুঁতভাবে দশ দিনের ডেডলাইন সেদিনই বলে দিতে পেরেছিল সেটা একটা বিস্ময়।

নিক্সনকে চীনের সঙ্গে গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্কের দিকে নজর এনে মনে করিয়ে দেয়া হয়, পাকিস্তানের নিরাপত্তার বিষয়ে আমেরিকার কিছু দায় আর প্রতিশ্রুতি আছে, এই দায় আমেরিকা কীভাবে মেটায় সেটা চীন নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখবে। তারা দেখতে চাইবে আমেরিকার কাছে আসলে বন্ধুত্ব বিষয়টা কী?

নিক্সন সভাকে জানান, তিনি ভারতের সব সাহায্য বন্ধ করে দিচ্ছেন এবং মানবিক সাহায্য ও আর অর্থমূল্যে দেয়া হবে না দেয়া হবে পণ্যে।

সূত্র : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 999

১৩

আমেরিকা চীনকে ভারত সীমান্তে সেনা পাঠাতে অনুরোধ করেছিল

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, নিক্সন আর কিসিঞ্জার একান্ত আলাপে বসেন।

নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন, যখন ইন্দিরা গান্ধী এখানে এসেছিলেন তখন আমি তাঁর প্রতি খুব সহজ ছিলাম । আমার সেটা থাকা উচিত হয়নি। তিনি আমাদেরকে বোকা বানিয়েছেন। কিসিঞ্জার এই আলাপে নিক্সনকে মনে করিয়ে দেন, নিক্সনকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যেন ইন্দিরা গান্ধীকে একান্তে শক্তভাবে ধমক দেয়া হয়। তাঁকে যেন বলা হয়, আমরা তোমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করব আর আগামী পাঁচ বছর যে-কোনও সুযোগ পেলেই তোমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করব। নিক্সন কিসিঞ্জারের সঙ্গে একমত পোষণ করে বলেন, সেটাই আমার করা উচিত ছিল। কিসিঞ্জার আবার ফোঁড়ন কাটেন, আমাদের আরেকটা দুর্বলতা হচ্ছে ওখানে (ভারতে) আমাদের

রাষ্ট্রদূত কেটস। নিক্সন হুঙ্কার দিয়ে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো একটা বাস্টার্ড, সান অব অ্যা বিচ। নিক্সন এ-ও বলেন, তাঁকে (ইন্দিরা গান্ধীকে) আমরা দেখে নেব। তাঁকে এর জন্যে পস্তাতে হবে। হয়তো আমরা ইন্ডিয়াকে চিরজীবনের জন্যে হারাচ্ছি, কিন্তু কে কেয়ার করে ইন্ডিয়াকে হারাচ্ছি নাকি সে থাকছে?

কিসিঞ্জার বলেন, আমরা আমাদের আমেরিকান জনগণের কাছে গিয়ে বলব– আমরা কী করেছি আর তারা কী করেছে, আর এর মধ্যেই তাদের (ইন্ডিয়ানদের) আড়ালে একটা গণহত্যা হয়ে যাবে পূর্ব পাকিস্তানে। তবে আমরা যদি চীনকে আমাদের বুকে আনতে সম্পর্ক আবার পুনঃস্থাপন করতে পারি, তখন ইন্ডিয়াকে আবার আমরা ফিরে পেতে পারি এক-দুই বছরের মধ্যে। এই পর্যায়ে নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন (ইন্দোনেশিয়ার) সুহার্তোর দূত যেই চিঠিটা নিয়ে এসেছে সেটায় কী আছে চেক করতে। *(সম্ভবত বাংলাদেশ সংকট নিয়েই সেই চিঠিটা ছিল)।*

নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন, তিনি যেন চীনাদের ভারতীয় সীমান্তের দিকে সেনা সমাবেশের একটা অনুরোধ করেন; তাহলে সেটা এই পরিস্থিতিতে হবে খুবই সিগনিফিকেন্ট। এবং এটাও যেন চীনাদের বলে দেয়া হয় যে, আমরা রাশিয়াকে একটা শক্ত নোট পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে আরো শীতল করে তুলছি। তবে এটা আপনি তাদের কীভাবে বলবেন সেটা নিশ্চয় আপনি বুঝেছেন। তখন কিসিঞ্জার সেটাকে কূটনীতির ভাষায় অনুবাদ করে বলেন, আমি তাদের চাপাচাপি করব না, তাহলে তারা সন্দেহ করতে পারে। আমি তাঁদের বলব, 'এই পরিস্থিতিতে যদি কিছু করা উচিত বলে আপনার মনে হয় তাহলে আপনি এটা ভেবে ভয় পাবেন না যে বা যারা এর বিরোধিতা করবে, তাদের বিরুদ্ধে আপনি একাই দাঁড়িয়েছেন।'

নিক্সন বলেন, চাইনিজেরা মুভ (ভারতীয় সীমান্তে সেনা সমাবেশ) করলে ইন্ডিয়ানরা একেবারে ভয়েই কাবু হয়ে শক্ত কাঠ হয়ে যাবে। তবে আবহাওয়া চীনাদের জন্যে একটা সমস্যা হতে পারে, কিসিঞ্জার মনে করিয়ে দেন নিক্সনকে। নিক্সন বলেন, আরে ধুর, ওরা যখন ইয়ালু ক্রস করে এলো (ইয়ালু চীন কোরিয়ার সীমান্তে একটি নদী, এখানে সম্ভবত কোরিয়া যুদ্ধের কথা বলা হচ্ছে) ভয়ানক শীতে, আমরা তো ভেবেছিলাম এরা বোকা, কিন্তু ঠিকই তারা

এসেছিল। কিসিঞ্জার বলেন, এইবার তারা (ভারতীয়রা) পশ্চিম পাকিস্তানে একটা বন্ধু সরকার বসাবে, আর এই ঠেলায় ইয়াহিয়ার পতন হবে তা নিশ্চিত। তবে আমরা দুটি মারাত্মক ভুল করেছি। আমরা এই কূটনীতি শুরু করেছি দুই সপ্তাহ পরে, আজকে যা করছি তা যদি আরো আগে করতে পারতাম তবে আমরা আরো সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতাম।

সূত্র : Vol. E7, No. 162

১৪

আমেরিকা কেন সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল

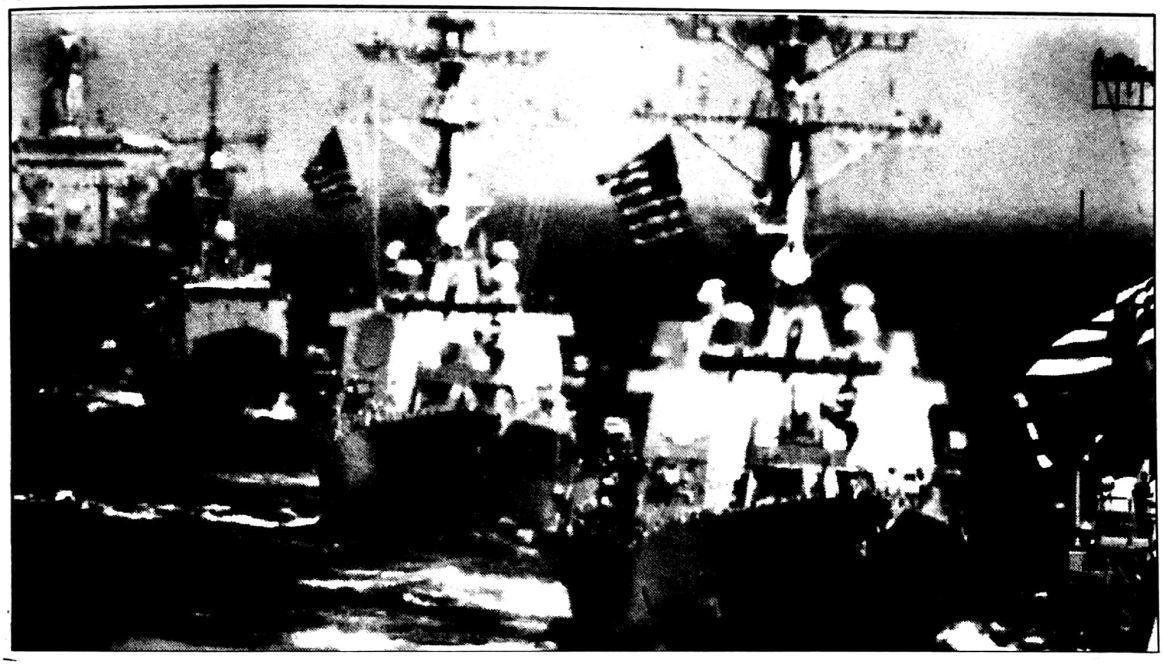

বাংলাদেশে একটা প্রচলিত ধারণা আছে এবং এই ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে দিতে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। এই প্রচারণাটা মূলত বাংলাদেশের সোভিয়েতমুখি বাম-প্রগতিশীলেরা এখনও করে আর ভারতের বামসহ প্রায় সব ঘরানা ব্যাপকভাবে সেকালে তা প্রচার করেছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা নৌবহর পাঠালে সেটা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারে অথবা ঠিক কীভাবে নেতিবাচকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে প্রভাবিত করতে পারে সেই বিশ্লেষণ তাদের পক্ষ থেকে কখনো হাজির করা হয়নি।

৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সিআইএ একটি জরুরি তারবার্তা পাঠায় হোয়াইট হাউজে, স্টেট ডিপার্টমেন্ট, আমেরিকান আর্মি, নেভী আর এয়ারফোর্সের চীফের কাছে। এই তারবার্তাটা মূলত ইন্দিরা গান্ধী এর আগের দিন মন্ত্রিসভার

মিটিং-এ ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনার কথা কী বলেছেন সে সম্পর্কে ব্রিফিং দেয়া নোট । এই ব্রিফিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই তথ্যের উপরে নির্ভর করেই এরপর কিসিঞ্জার নিক্সনকে একটা ব্রিফিং দেন দিনের শেষে। আর সেই ব্রিফিং ও তারপরে বিস্তর আলোচনার পরেই নিক্সন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পাঠানোর আদেশ দেন। কিসিঞ্জারের প্রেসিডেন্টকে দেয়া সেই ব্রিফিং-এর সময়েই প্রস্তাব রেখেছিলেন বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর।

তাহলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ইন্দিরা গান্ধী তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনা ও লক্ষ্য সম্পর্কে কী বলেছিলেন? অথবা বলা যায়, সিআইএ সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠানো ব্রিফিং নোটে ঠিক কী ছিল?

সিআইএ জানাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রী পরিষদকে জানিয়েছেন, ভারত কূটনৈতিক ফ্রন্টে ভালো করছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে ভারতের অবস্থানকে যেভাবে সমর্থন করছে তাতে সোভিয়েত-ভারত চুক্তির (২৫ বছরের মৈত্রী ও সামরিক চুক্তি) সুফল সরাসরিই দেখা যাচ্ছে। এছাড়া, ফ্রান্স ও বৃটেন যেভাবে নিরাপত্তা পরিষদে ভূমিকা রেখেছে তাতে ভারত খুশী। উল্লেখ্য, নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন ও ফ্রান্স আমেরিকার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের ভোটদানে বিরত ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী বলেন, যেহেতু জাতিসংঘে আমেরিকান যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে চীন যে পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করছে সেটা ঠিক আছে। কিন্তু তবু আমরা আশা করি, চীন আরও ভারসাম্যমূলক অবস্থান নিক। ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন, চীনারা উত্তরে পাকিস্তানের পক্ষে সৈন্য সমাবেশ বা হস্তক্ষেপে করছে না। এছাড়া যদিও সোভিয়েতরা আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে সব কিছু সত্ত্বেও পরিস্থিতি আমাদের ফেবারে মনে হচ্ছে তাহলেও মনে রাখতে হবে চীনারা চাইলে এখনও লাদাখ আর চুম্বি এলাকায় অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু করতে পারে। অবশ্য যদি তারা সেটা করে তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা অ্যাকশন নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইন্দিরা গান্ধী জানান, আমেরিকা আবারও জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনতে পারে কিন্তু ভারত এটা কখনই মেনে নেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতের তিনটা উদ্দেশ্য পূরণ না হয় :

ক. বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়

খ. আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ অংশ স্বাধীন না হয় ও ভারতে যুক্ত হয়

গ. পাকিস্তানের সামরিক শক্তি এমনভাবে ধ্বংস হয় যেন সে আর কখনও ভারতের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালাতে না পারে।

কিসিঞ্জার যে-কারণেই হোক সিআইএ'র এই রিপোর্টকে বেশ গুছিয়ে নিক্সনের কাছে দিনের শেষে পেশ করেন। নিক্সন বলেন,

তারা (ভারত) তাদের সেনা পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসছে; এরপরে তারা পাকিস্তানের পদাতিক বাহিনী ও বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করে দেবে এবং কাশ্মীরের যেই অংশ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে আছে তাকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেবে। তারপরে সবকিছু সে বন্ধ করবে। এই কেন্দ্রাতিক বলে পশ্চিম পাকিস্তানেরও কিছু অংশ স্বাধীন হয়ে যাবে। বাকি পশ্চিম পাকিস্তানও বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হয়ে যাবে। কিসিঞ্জার এই প্রসঙ্গে সিআইএ'র ডিরেক্টর রিচার্ড হেলমের রেফারেন্সে বলেন, তিনি রিচার্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন, রিচার্ড মনে করেন, এই ঘটনার ফলাফল মধ্যপ্রাচ্যে হবে ভয়ানক বিপর্যয়কর। যদি আরবেরা এটা দেখে মনে করে এভাবেই তারা (ভারত যেভাবে সাহায্য পেয়েছে সেভাবেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে থেকে) সাহায্য পায়, তবে ইসরাইলের খবর আছে।

নিক্সন বলেন, এটা আমাদের জন্যে তাই এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ যে (বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাক, এটা ডেস্টিন্ড তবে) ভারতকে পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। এজন্যে তিনটি পদেক্ষেপের কথা নিক্সন উল্লেখ করেন :

১. চীনাদের সৈন্য ভারতের সীমান্তের দিকে ধাবিত করানোর জন্যে তাদেরকে একটা নোট দেয়া

২. বঙ্গোপসাগরে একটি ক্যারিয়ার যুদ্ধজাহাজ পাঠানো

৩. রাশিয়াকে একটা ঝাঁঝালো নোট পাঠানো এটা বলে যে, আমরা আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে যতটুকু যা যা অর্জন করেছি এতোদিনে সব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

তাহলে আমরা এখন স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, সপ্তম নৌবহর পাঠানোর আমেরিকান সিদ্ধান্ত হওয়ার পিছনে ট্রিগার টেনে দেওয়া ঘটনাটা হলো, ইন্দিরা

গান্ধীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনোভাব। আর সেই মনোভাব হলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের উছিলায় কাশ্মীর বিতর্ক বিরোধেরও একটা হাল করে নেওয়া আর সে সম্পর্কে মন্ত্রিসভায় বিফ্রিং দিয়ে জানানো। এক মাছের তেলে আর এক মাছ ভাজার পরিকল্পনা।

ইন্দিরার এই ইচ্ছে টের পেয়ে আমেরিকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ভারত যেন পাকিস্তানকে আক্রমণ না করে এবং আজাদ কাশ্মীরকে স্বাধীন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা না নেয়। আর বিস্তর আলাপের আর্কাইভ থেকে এটা পরিস্কার যে, আমারিকান নীতি নির্ধারকদের কোনও আলাপেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে থামিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় অথবা সপ্তম নৌবহর পাঠানোর পিছনে এমন উদ্দেশ্য-পরিকল্পনা কাজ করেছে বলে প্রমাণ নেই। অন্তত আর্কাইভে বিস্তর খোঁজাখুঁজি করেও আমরা তা দেখছি না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে কেন এই প্রচার এতদিন ধরে আমাদের শোনানো হয়েছে, যা সত্য নয়? এর কারণ একটাই হতে পারে, ভারত যখন দেখেছে আমেরিকা তাদের সে পরিকল্পনা টের পেয়ে পাল্টা ব্যবস্থা আয়োজন করতে শুরু করেছে। তখন ভারতের কাশ্মীর দখলের পরিকল্পনা আড়ালে ফেলে রাখা ভাল আর সেকাজে একটা কাভারেজ বয়ান থাকা দরকার। সেজন্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ঠেকিয়ে দেয়ার কথিত মার্কিন প্রয়াসের এই বয়ান। তাহলে বাংলাদেশের বামেরা এই ভারতীয় বয়ান প্রচার করেছে ভারতের কুচিন্তা আড়াল করার উদ্দেশে।

এছাড়া অন্য আর এক কারণ বলা যায়, আমরা ইতিহাসবিমুখ এবং নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্বেষণের চেয়ে বানিয়ে বা তৈরি করে দেয়া বয়ান প্রচারই আমাদের অনেকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেহেতু এই প্রচারণা সোভিয়েত ঘরানার বামেরাই করেছে তাই এটা ধরে নেয়া অসঙ্গত হবে না, এই মুক্তিযুদ্ধকে ঠেকানোর জন্যে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর পাঠানোর প্রচার ছিল সোভিয়েত জমানায় 'কোল্ড ওয়ারের' কালে খুবই একটা পরিচিত প্রপাগাণ্ডার কৌশল।

কিন্তু ইতিহাস বড় নির্মম। সে তার ধুলোকালি ঝেড়ে ফেলে আপন মহিমায় একদিন উত্থিত হবে, সেটা মনে হয় রুশ-ভারতের এদেশীয় প্রচারকদের জানা ছিল না।

সূত্র

1. Vol E7 No 165
2. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 642, Country Files, Middle East, India/Pakistan Situation. Secret; Priority; No Foreign Dissem. Circulated in Washington to the White House, the Departments of State and Defense, DIA, the JCS, within Defense to the Departments of Army, Navy, and Air Force, to NIC, NSA, and the Office of Current Intelligence.

১৫

১০ ডিসেম্বরেই পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণের ইচ্ছে পোষণ করে

পাকিস্তানের সামরিক ক্ষমতা সম্পর্কে আমেরিকার কোনও ইলিউশন ছিল না। তারা মোটামুটি জানত, পাকিস্তান খুব বেশিদিন ভারতীয় আক্রমণ রুখতে পারবে না। পয়লা ডিসেম্বরে আমেরিকার পলিসিমেকারদের সভা অ্যাকশন গ্রুপের মিটিং-এ কিসিঞ্জার যখন জয়েন্ট চিফ অব স্টাফের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় আক্রমণের মুখে পাকিস্তান কতো সময় টিকতে পারবে? জয়েন্ট চিফ অব স্টাফ অ্যাডমিরাল মোরের বলেছিলেন, দুই অথবা তিন সপ্তাহ টিকতে পারে।[১]

কিন্তু ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের মিলিত আক্রমণে এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়।

দিশেহারা অবস্থায় পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষ সামরিককর্তারা ১০ ডিসেম্বরেই ঢাকাস্থ জাতিসংঘের দফতরে ছয়টি প্রস্তাব নিয়ে যায়। প্রস্তাবগুলো ছিল :

ক. পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর

খ. এই মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি

গ. পাক সেনাদের নিরাপদে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা

ঘ. যারা ফিরে যেতে চায় এমন সকল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রত্যাবর্তন

ঙ. যারা ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেটেল করেছে তাদের নিরাপত্তা

চ. প্রতিশোধ না নেয়ার নিশ্চয়তা

এই ছয়টি প্রস্তাবের মধ্যে 'আত্মসমর্পণ' কথাটি যদিও নেই, তবুও এই ছয়টি প্রস্তাব একটি সামরিক বাহিনীর পক্ষে নিজের সম্মান বাঁচিয়ে প্রতিপক্ষকে দেয়া আত্মসমর্পণের সমতুল্য বলেই বিবেচিত হবে।

কিসিঞ্জার ১০ ডিসেম্বর নিক্সনকে জানাচ্ছেন, ভারতীয়রা সাফল্যজনকভাবে কাশ্মীরে পাকিস্তানি আক্রমণ ঠেকিয়ে দিতে পেরেছে। ইতিপূর্বে আমরা ইন্দিরার বাংলাদেশ স্বাধীন করার পর সেই সুযোগে কাশ্মীরের পাকিস্তান অংশও দখল নেওয়া যায় কিনা সেই গোপন পরিকল্পনার কথা বলেছিলাম। এর মানে এই না, পাকিস্তানেরও ভারতীয় কাশ্মীর আক্রমণের কোনই পরিকল্পনা ছিল না, তা নয়। এই অর্থে কিসিঞ্জার বলছেন, ভারতীয়রা পাকিস্তানের সম্ভাব্য সেই ভারত-কাশ্মীর আক্রমণের সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছে। তবে ভারতীয়রা সেখানে পাল্টা পাকিস্তান আক্রমণের চেষ্টা বাদ দিয়েছে, মনে হয়েছে কিসিঞ্জারের কাছে। তবে পুনঃপুনঃ আকাশপথে ভারতীয় আক্রমণের পাল্টা করাচির নৌ বেইস থাকে গোলা আক্রমণ পাকিস্তানের পেট্রোলিয়াম সাপ্লাইয়ে মারাত্মক হুমকি তৈরি করেছে। পাকিস্তানের খুব বেশি হলে দু সপ্তাহ বা আরো কম সময়ের জন্যে পেট্রোলিয়াম সাপ্লাই আছে। উত্তরের অবস্থানগুলোতে এবং লাহোরে ভারতীয়রা যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আকাশ থেকে হামলা করছে।

নৌযুদ্ধে পাকিস্তান কার্যত হাত গুটিয়ে বসে আছে। ইয়াহিয়া অভিযোগ করছেন, যে জাহাজ থেকে পাকিস্তানি ডেস্ট্রয়ারকে ধ্বংস করা হয়েছে সেখানে সোভিয়েত টেকনিশিয়ান ছিল।

তবে কিসিঞ্জার নিক্সনকে আর এক ইন্টারেস্টিং তথ্য জানান। কিসিঞ্জার গোপন উৎসের বরাতে বলেছেন, ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন যে তাঁর কাছে তথ্য আছে, চীন ঢাকার পতনের আগেই চীন ভারত সীমান্তে আক্রমণ শানাতে পারে। যদিও ইন্দরা গান্ধী তাঁর তথ্যের উৎস বলেননি। আবার আমেরিকার কাছে এ বিষয়ে খুবই নির্ভরযোগ্য কোনও তথ্য নেই সেটাও নিক্সনকে কিসিঞ্জার জানিয়ে দেন।

পাকিস্তান থেকে নিউ ইয়র্কে ভুট্টোর নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল আসছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে, সেই সময়ে ভুট্টো নিক্সনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন বলেও কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান।

কিসিঞ্জার এ-ও জানাচ্ছেন ভারত পাকিস্তানে অবস্থিত বিদেশীদের সরে যাওয়ার জন্যে আজ ও কাল চার ঘণ্টা করে ঢাকায় বিমান আক্রমণ বন্ধ রাখবে বলে জানিয়েছে। আর বিমানবন্দরে ২৪ ঘণ্টা আক্রমণ বন্ধ রাখবে সেটাও ভারত জানিয়েছে। তবে একজন পদস্থ জাতিসংঘ কর্মকর্তা ঢাকাতেই থেকে যাচ্ছেন যেন তিনি যুদ্ধবিরতি বা আত্মসমর্পণের কাজে সহায়তা দিতে পারেন।[২]

এসব কথা থেকে এটা পরিস্কার যে অন্তত ১০ ডিসেম্বরের আগেই যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছিল আর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাকি ছয়দিন আসলে ছিল আনুষ্ঠানিক সারেন্ডারের লক্ষ্যে জাতিসংঘসহ সংশ্লিষ্ট সবার প্রস্তুতির সময়কাল।

সূত্র

১. National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, NSC Institutional Files (H-Files), Box H–115, WSAG Minutes, Originals, 1971. Top Secret; Sensitive. No drafting information appears on the minutes. The meeting was held in the White House Situation Room. A briefer version of the meeting, prepared by James Noyes (OASD/ISA), is in the Washington National Records Center, OSD Files, FRC 330 76 0197, Box 74, Pakistan 381 (Dec) 1971.

২. National Archives, Nixon Presidential Materials,NSC Files, Box 37, President's Daily Briefs, Dec 1–Dec 16, 1971. Top Secret; Sensitive; Codeword.

১৬

ব্রেজনেভকে আমেরিকার হুঁশিয়ারি

১০ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৯৭১। নিক্সন ব্রেজনেভকে এদিন একটা চিঠি লেখেন। এই চিঠিটা স্পষ্টতই ব্রেজনেভকে দেয়া কিছুটা আমেরিকান হুমকি, তবে তা ডিপলোম্যাটিক ও তত্ত্বকথার আড়ালে। চিঠিটা খুবই দক্ষ হাতে মুসাবিদা করা। স্নায়ু যুদ্ধের আমলের স্নায়ু যুদ্ধ চালানোর আরও কিছু নীতি বোঝাপড়ার দিক এখান থেকে সূচনা হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। ডিসেম্বরের ৬ তারিখে নিক্সন ব্রেজনেভকে আরেকটা চিঠি দিয়েছিলেন। সেখানে ব্রেজনেভকে মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে ভারত উপমহাদেশে আরেক দেশের সার্বভৌমত্বে নাক গলিয়েছে এবং দুঃখজনকভাবে আপনারা (সোভিয়েত রাশিয়া) সেই পররাষ্ট্র নীতিতে সমর্থন দিয়েছেন। যেহেতু আপনার দেশ ভৌগলিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের খুব কাছে, তাই হয়তো এই সংঘাতে আপনারা নিজেদের জন্যে নিরাপত্তা বিষয়ক আগ্রহের সঞ্চার করেছে। কিন্তু এটা হলে অন্যান্য দেশগুলো যারা কাছে বা দূরে আছে তারাও তাদের

নিরাপত্তা আগ্রহের বিষয়টা বিবেচনা করতে শুরু করবে। ফলে এই স্থানীয় সংঘাতটা আন্তর্জাতিক রূপ নিয়ে ফেলতে পারে। নিক্সন এই চিঠিতে ব্রেজনেভকে মনে করিয়ে দেন, আমরা দুই দেশ এমন একটা বোঝাপড়ার মধ্যে কাজ করি যে আপনারা বা আমরা কেউই কোন পরিস্থিতি থেকে এককভাবে কোনও সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করব না। কিন্তু আপনার দেশ প্রকাশ্যে ভারতকে সমর্থন করে যাচ্ছে যেখানে ভারত আরেকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালাচ্ছে। আপনার (সোভিয়েত রাশিয়া) যেহেতু ভারতের ওপর দারুণ একটা প্রভাব আছে তাই পাকিস্তানের ভৌগলিক অখণ্ডতা রক্ষায় আপনার উদ্যোগ ভালো কাজে দেবে। নিক্সন এটাও মনে করিয়ে দেন, এই সংঘাতে ভারত বিজয়ী হলেই সব মিটে যাবে এই চিন্তা করাটা ঠিক হবে না। বরং তা আরো নতুন নতুন আন্তর্জাতিক সংকটের জন্ম দেবে। এছাড়াও আপনারা ও আমরা দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় যে পারস্পরিক আস্থা আর বিশ্বাসের ক্ষেত্র তৈরি করেছিলেম তাও নষ্ট হয়ে যাবে।

১০ তারিখের চিঠিতে নিক্সন ব্রেজনেভকে বলেন, আমার আগের চিঠির পরে পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে। এবং স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক শান্তির জন্যে তা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই সংকটে যদি যুদ্ধবিরতি না হয় তাহলে আমরা (আমেরিকা) এই অবস্থাকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ভারতের আগ্রাসন বলে ধরে নেব। এবং এটা হলে আমাদের পাকিস্তানের নিরাপত্তায় কিছু দায় আছে। চিঠির শেষে নিক্সন মনে করিয়ে দেন, তাদের একটা (আমেরিকা-রাশিয়া) যৌথ আপিল হয়তো এই প্রত্যাশিত যুদ্ধবিরতিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

সেদিনই কিসিঞ্জার আমেরিকায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের কাছে নিক্সনের চিঠি প্রসঙ্গে বলেন 'পাকিস্তানের কাছে আমেরিকার দায়'টা আসলে কী? এই দায় হচ্ছে '৬২ সালে কেনেডির সঙ্গে পাকিস্তানের নিরাপত্তা সহযোগিতা চুক্তি। যার ফলে আমেরিকা সেনা ও অস্ত্র দিয়ে পাকিস্তানকে সাহায্য করতে বাধ্য। তিনি এটাও মনে করিয়ে দেন, এই চুক্তি যেহেতু ডেমোক্রেটদের প্রেসিডেন্টের করা ছিল বিধায় তারাও (ডেমোক্রেটরা) সিনেটে বা কংগ্রেসে এটা নিয়ে মাঠ গরম করবে না।

কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে এটাও মনে করিয়ে দেন, আমেরিকা ইতিমধ্যেই সেনা মুভমেন্ট শুরু করেছে (এখানে সম্ভবত সপ্তম নৌবহরের কথা বলা হচ্ছে) যদিও এটা আগামী রবিবার বা ১২ ডিসেম্বরের আগে দৃশ্যমান হবে না। এই কথা বলার পরে নিক্সনকে কিসিঞ্জার বলেন, এই ১২ তারিখের উল্লেখটা করা হয়েছে একটা প্রচ্ছন্ন ডেডলাইন হিসেবে যেন তার মধ্যেই সোভিয়েতরা যুদ্ধবিরতির আপীল করতে রাজী হয়।

তবে শেষ কথা হলো, আমেরিকার দিক থেকে এটা মূলত ভারতের তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। নিয়ন্ত্রিত বলতে তা যেন পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশকে) বিচ্ছিন্ন করার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। ফলে 'আমেরিকারও অবলিগেশন আছে' এটা কেবল মনে করিয়ে দিয়ে (কিন্তু অবলিগেশন পালনে আমেরিকার যাওয়ারও ইচ্ছে নেই) আমরা তা দেখছিও না। আবার পাকিস্তানেরও ১০ ডিসেম্বর তারিখের পর আর কোনও সামরিক-আমেরিকা তাদেরকে উদ্ধারে আসবে এমন কোন আকাঙ্খার কথাও জানা যায় না। বরং তারা সারেন্ডার করতেই ইতোমধ্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত তাই জানা যায়।

সূত্র : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 497, President's Trip Files, Exchange of Notes Between Dobrynin and Kissinger, Vol. 2. No classification marking

১৭

ভারতের সঙ্গে সামরিক সংঘাতে জড়াতে কিসিঞ্জার চীনকে উস্কে দিয়েছিল

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১। সন্ধ্যাতেই কিসিঞ্জার নিউ ইয়র্কে আসেন জাতিসংঘে চীনাদের স্থায়ী প্রতিনিধি হুয়াং হুয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু কেন আসেন এর কোনও লিখিত ইঙ্গিত কোথায়ও নেই। এমনকি যে শিরোনামে এটা টুকে রাখা হয়েছে, সেখানে খুবই সাধারণভাবে বলা হয়েছে— কথোপকথনের স্মৃতি। কার সঙ্গে কথোপকথন তা-ও বলা নেই।

তবে কী কাজ সেখানে হলো তা দেখে অনুমান করা ও তা বলা যেতে পারে। আসলে কিসিঞ্জার এসেছেন ঐদিনই সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে দেয়া চিঠির আলোকে এখন বিভিন্ন ফোরামে যে অবস্থান নিবেন সেই অবস্থান চীনের সঙ্গে সমন্বয় করে নেয়া; ফলে যদি একই লাইনে দুই রাষ্ট্র এগুতে চায় তবে এই বাড়তি লাভ দুপক্ষই পেতে পারে। তাই চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ভারত ও সোভিয়েত বিষয়ে আমেরিকার সব অবস্থানের অগ্রগতি কিসিঞ্জার এখানে হুয়াং হুয়ার সঙ্গে শেয়ার করবেন।

এই সভায় কিসিঞ্জারের সঙ্গে ছিলেন পরবর্তীকালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ, যিনি ঐসময় ঐ সভায় হাজির ছিলেন কারণ তিনি তখন জাতিসংঘে আমেরিকার স্থায়ী প্রতিনিধি, হুয়াং হুয়ার কাউন্টার পার্ট; তাই। কিসিঞ্জার নিজেই হুয়াং হুয়াকে জানান, ঐ সভার খবর আর কেউ জানে না। এই সভাতেই কিসিঞ্জার হুয়াং হুয়াকে জানান, আমেরিকা ইতোমধ্যে ভারতকে প্রতিশ্রুত ৮৭ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ বাতিল করেছে এবং এছাড়া সাকুল্যে ৩১ মিলিয়ন ডলারের একটি সামরিক সরঞ্জামের বিক্রির চুক্তি বাতিল করেছে। একটি রাডার সরবরাহের কথা ছিল সেটাসহ পুরো বিক্রি চুক্তির পেন্ডিং অংশ যা ছিল তা সহ সব বাতিল করেছে। এছাড়াও পি এল ৪৮০-র অধীনে ৭২ মিলিয়ন ডলারের একটি খাদ্য সহায়তা প্রস্তাব ছিল ফাইনাল স্বাক্ষরের অপেক্ষায়, তাও বাতিল করেছে। আর সঙ্গে ৭২ মিলিয়ন ডলারের একটা ঋণ দেয়ার কথা ছিল পিএল ৪৮০ প্রোগামে অধীনে খাদ্য সাহায্যের, সেটা বাতিল করেছি। ওদিকে বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমেও একটা ঋণ চুক্তির পরের কিস্তি হিসাবে ৭৫ মিলিয়ন ডলারের এক পাওনা হাজির হয়েছিল। সেটাও আমরা আটকে দিয়েছি।

কৌতূহলউদ্দীপক বিষয় হচ্ছে সোভিয়েত অস্থায়ী-দূত ভরন্তসভের সঙ্গে কিসিঞ্জারের কথোপকথনের সারমর্মও হুয়াং হুয়াকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন কিসিঞ্জার। কিসিঞ্জারের উদ্দেশ্যের দিক মনে রাখলে বোঝা যায় তিনি এটা কেন করেছেন।

কিসিঞ্জারের এই সভার আর এক উদ্দেশ্য ছিল চীনকে ভারতের সঙ্গে সরাসরি সামরিক সংঘাতে জড়াতে আগ্রহী করে তোলা। যদিও তিনি এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে সরাসরি না বলে সেটাকে কূটনীতির ভাষাতে বলেছেন। কিসিঞ্জার বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন আপনাকে জানাতে বলেছেন :

> 'এই পরিস্থিতিতে চীন কী করবে তা একান্তই চীনের নিজস্ব সিদ্ধান্তের বিষয়, কিন্তু যদি চীন মনে করে যে ভারতীয় উপমহাদেশের চলমান ঘটনা চীনের নিরাপত্তার জন্যে হুমকি এবং সেকারণে চীন যদি তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে কোনও পদক্ষেপ নেয় এবং চীনের সেই উদ্যোগকে কেউ বাধা দিলে আমেরিকা তাকে ঠেকাবে।'

এর সরল অর্থ হচ্ছে, চীন ভারতের সঙ্গে নিজের স্বার্থ বুঝে নিক, আর কেউ চীনকে বাগড়া দিলে আমেরিকা তাকে ঠেকাবে।

হুয়াং হুয়া জানান, এই বিষয়ে চীনের অবস্থান হচ্ছে, এমন একটি জাতিসংঘের সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয়া যা একইসঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি ও যৌথ সেনা প্রত্যাহার নিশ্চিত করবে। চীন মনে করে জাতিসংঘের বর্তমান অবস্থান দুর্বল, কারণ জাতিসংঘ শুধু যুদ্ধবিরতি চাইছে কিন্তু কোনও সেনা প্রত্যাহার চাইছে না। কিসিঞ্জার এখানে বলেন, কেন তারা নীতিগতভাবে সেনা প্রত্যাহার চাচ্ছে না, কারণ সেনা প্রত্যাহার চাইলে পূর্ব পাকিস্তান থেকেও পাকিস্তানি সেনা প্রত্যাহার করতে হয়।

সিনিয়র বুশ ও কিসিঞ্জার পরবর্তীকালে কোনো এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে। সিনিয়র বুশ মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ে জাতিসংঘে মার্কিন তরফে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন

হুয়াং হুয়া আবার কিসিঞ্জারকে জানিয়ে দেন, তারা পাকিস্তানের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের সমঝোতার বিপক্ষে এবং এই সমঝোতার উদ্যোগ নিয়ে আমেরিকা ভুল কাজ করেছে। এটা করলে তা চীনে জাপানের তৈরি পাপেট স্টেট মাঞ্চুরিয়ার মতো বাংলাদেশ আরেকটা স্টেট হবে।

তখন কিসিঞ্জার জোর দিয়ে বলেন, আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেব না, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে কোনও নেগোশিয়েশন করব না, আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও আলাপকে উৎসাহিতও করব না।

খুব ওপর থেকে একসঙ্গে সবকিছুকে দেখলে, এই বিচারে কিসিঞ্জার করতে চান বলে বলছেন, তা করার দরকার নাই, সেটা করা সম্ভবও না, এবং এতে কোনও কাজ হবে না আর এটা তিনি জানতেন। কারণ ঘটনা এক, পাকিস্তানের মালেক সরকার পরের দিনই জাতিসংঘকে সারেন্ডারের আয়োজন করতে অনুরোধ জানাতে যাচ্ছেন। পরের দিন ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। আসলে পুরো হতাশ ইয়াহিয়া পাক মিলিটারি ক্ষমতাসহ সব কিছু ভুট্টোকে ডেকে ইতোমধ্যেই দিয়ে দিয়েছে, অনাষ্ঠুনিকভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে আর তারা জেনে গেছে একমাত্র ভুট্টোই তাদের ভাগ্যে যা করার তা রচনা করবেন। ঘটনা দুই, তাই কিসিঞ্জার চাইছেন ভারতের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধে যাওয়ার বা প্রস্তুতির দরকার নেই। কিন্তু তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানের যা আছে এখনও তা সংরক্ষণই তার আসল লক্ষ্য'। এর অর্থ বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে তার আপত্তি নেই। কিন্তু এখানেই শেষ হোক সব কিছু, কাশ্মীরের দিকে যেন অবশ্যই না যায়। আর সে কাজে চীন ভারতকে নড়াচড়ার ভয় দেখাক। মিটিংয়ের শেষ অবধি দেখে মনে হয়েছে কিসিঞ্জার মোটাদাগে সফল। কথাগুলো নিজস্ব পাঠ ও মূল্যায়ন হিসেবে বলা হলো।

সূত্র : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 849, For the President's File, China Trip, China Exchanges, October 20, 1971. Top Secret; Sensitive; Exclusively Eyes Only. According to an attached memorandum from Lord to Kissinger, December 15, Lord drafted the memorandum and Kissinger approved it as accurate. Kissinger's account of this conversation with Huang Hua is in The White House Years, p. 906

১৮

আমেরিকাকে তাঁতিয়ে দেয়ার জন্যে ভুট্টোর কৌশল

ভুট্টোর কথোপকথনের এই ঘটনাবলী ডিসেম্বর ১১, ১৯৭১, সন্ধ্যার।

জাতিসংঘের বৈঠকে যোগ দিতে ভুট্টো নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন। আমরা আগেই দেখেছি ভুট্টো নিক্সনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। ১১ তারিখ সন্ধ্যায় কিসিঞ্জার ক্যাম্পডেভিডে নিক্সনকে ফোন করেন। নিক্সন ক্যাম্পডেভিডে অবকাশযাপনে ছিলেন। এমন জটিল মুহূর্তে ক্যাম্পডেভিডে অবকাশযাপনের বিষয়টা একটু অদ্ভুত ঠেকতে পারে। কিন্তু কিসিঞ্জার আর নিক্সনের আলাপটা গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়, ভুট্টোর সঙ্গে যেন দেখা করতে না হয়, সেই উদ্দেশ্য থেকেই নিক্সন নিক্সন অবকাশযাপনের অছিলায় ক্যাম্পডেভিডে চলে গিয়েছিলেন। নিক্সন ভুট্টো সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতেন না, নানা সময়ে নিক্সন ভুট্টোকে জনতোষণী নেতা (Total Demagogue), জঘন্য জারজ (Terrible bastard), দুশ্চরিত্রার উন্নতজাতের সন্তান (elitist son-of a bitch) বলে অভিহিত করেছিল ।

কিসিঞ্জার নিক্সনকে ফোন করে বলেন, ভুট্টো সম্ভব হলে আজকে সন্ধ্যায় দেখা করতে চান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। নিক্সন শীতল কণ্ঠে কিসিঞ্জারকে বলেন, তিনি যে ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করবেন না সেটা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। তবে ভুট্টো কী বলতে চান সেটা তিনি শুনতে রাজী আছেন। কিসিঞ্জার জানান, ভুট্টোর সঙ্গে চীনাদের আলাপ হয়েছে। চীনারা ভুট্টোকে জানিয়েছে, তারা কিছু করতে চায়। এখানে কিসিঞ্জার বলেন, তিনি নিজেও মনে করেন চীনারা কিছু করতে চায় কিন্তু তাদের (চীনাদের) আমাদের (আমেরিকার) সম্পর্কে সন্দেহ আছে। কারণ আমরা প্রথমে ভারতের আক্রমণকে 'আগ্রাসন' বলে অভিহিত করেছি, তারপর আর 'আগ্রাসন' বলে অভিহিত না করে বলেছি, 'অযৌক্তিক'। তারপরে সেটা থেকে সরে এসে আমরা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছি। তাই তারা মনে করছে আমাদের এই বিষয়ে কোনও শক্ত ও ধারাবাহিক অবস্থান নেই। তারা (চীনারা) স্পষ্টভাবে জানতে চায়, যদি রাশিয়ানরা তাদের চাপ দেয় (এখানে সামরিক চাপের কথা বলা হয়েছে) তাহলে আমরা কী করব? এখানে কিসিঞ্জার তাঁর অসহায়ত্ব পুরোটাই ফুটিয়ে তুলে নিক্সনকে বলেন, আমি এর জবাবে ভুট্টোকে কিছুই বলতে পারিনি।

এখানে কিসিঞ্জার বলেন, ভুট্টোর কাছে চীনাদের বক্তব্য একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। আমি জানি, আমরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জনমত, সিনেট কংগ্রেস–এই নানামুখি চাপের মধ্যে আছি। কিন্তু আগামীকালের মধ্যেও যদি রাশিয়ানদের কাছ থেকে চিঠির জবাব না পাই তাহলে আমরা ব্রেজনেভকে লেখা উল্লেখিত ঐ চিঠির প্রস্তাব অনুসারে চলব কিনা?

এর মানে, এখানে কিসিঞ্জার বলতে চাইছেন, ব্রেজনেভকে দেয়া চিঠিতে উল্লেখিত ছিল যে, 'আমাদের বন্ধুরাষ্ট্রে আগ্রাসন হয়েছে এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায় আছে'–সেইরকম কোনও বক্তব্য আমেরিকা দেবে কিনা?

এখানে কিসিঞ্জার ভুট্টোকে উদ্ধৃত করে বলেন, ভুট্টোকে চীনারা বলেছে, রাশিয়ানরা বড় ধরনের নরপশু আর কাপুরুষ। তবুও তারা এমন করতে পারছে কারণ তারা ভেবেছে, আমেরিকা দুর্বল রাষ্ট্র। এই কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিসিঞ্জার নিক্সনকে মনে রাখতে বলেন, আমি কোনও মতামত দিচ্ছি না ভুট্টো যা বলেছেন আমি তা-ই বলছি। এখানে পাঠক লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, ভুট্টো কূটনৈতিক শিষ্টাচার ভঙ্গ করেই আমেরিকার ইগোকে উস্কে দিতে কিছু অগ্রহণযোগ্য অকূটনৈতিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমেরিকার ইগোকে তাঁতিয়ে দেয়ার ভুট্টোর কৌশলে কাজ হয়েছে বলেই দৃশ্যমান হয়। এই কথা বলার পরেই সিদ্ধান্ত হয়– আগামীকাল নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা পাকিস্তানে ভারতের আক্রমণকে শুধু 'আগ্রাসন' বলে নয়, আর এক কাঠি বাড়িয়ে 'নগ্ন আগ্রাসন' বলবে, এবং এই বিষয়ে সিনিয়র বুশকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে বার্তা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

কিসিঞ্জার এখানে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের কার্যত পতন হয়ে গেছে এবং আমাদের কারোই কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে আমরা সোভিয়েত সমর্থিত 'নগ্ন আগ্রাসনের' মোকাবেলা করছি। এই কথোপকথনে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে অবশ্যম্ভাবী সেটা আমেরিকা মেনে নিচ্ছে কিন্তু এই স্বাধীনতাতেই যেন ভারতের আকাঙ্ক্ষা থেমে যায়, পাকিস্তানকে যেন আরো বেশি মাশুল গুনতে না হয় সেটাই এখন আমেরিকার মূল বিবেচ্য।

সূত্র

১. Vol. E7, Nos 156, 171, 178
২. Library of Congress, Manuscript Division, Kissinger Papers, Box 370, Telephone Conversations

১৯

কিসিঞ্জার সপ্তম নৌবহর পাঠানোর বিরুদ্ধে ছিলেন

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১। নিক্সন আর কিসিঞ্জারের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ব্রেজনেভ আমেরিকাকে একটা পাল্টা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। ব্রেজনেভ বলছেন, তারা যুদ্ধবিরতি করতে ভারতকে রাজি করাতে পারে যদি ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নেগোশিয়েট করে। মুলত এই প্রস্তাবের নানা দিক নিয়ে আলোচনার জন্যেই নিক্সন আর কিসিঞ্জার এইদিন একত্রে বসেন।

কিসিঞ্জার ব্রেজনেভের এই প্রস্তাবকে আমেরিকার জন্যে 'রাফ ডিল' হিসেবেই নিক্সনের কাছে উপস্থাপন করেন। ব্রেজনেভের সেই চিঠিতে শুধু বাংলাদেশ প্রসঙ্গই ছিল না, ছিল মোট চারটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব। সেগুলো ঠিক প্রস্তাব আকারে ছিল না, ছিল হিডেন মিনিং হিসেবে, যা কিসিঞ্জার নিক্সনকে ব্যাখ্যা করেছেন এই আলাপে। কিসিঞ্জার অবশ্য এখানে খুব স্পষ্ট করেই নিক্সনকে মনে করিয়ে দেন, এই সংঘাতে আমেরিকার এখন আর একটাই চাওয়া, আর

তা হচ্ছে, ভারত যেন পশ্চিম পাকিস্তানকে আক্রমণ ও কাশ্মীর দখল না করে।

কিসিঞ্জারের মতে, রাশিয়ার চাওয়াগুলো হলো :

১. তারা মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার সমাধান চায়

২. তারা ইউরোপিয়ান নিরাপত্তা সম্মেলন করতে চায়

৩. তারা ব্যবসা করতে চায়

৪. এবং সেই নিরাপত্তা সম্মেলনে তারা নিক্সনকে চায়

কিসিঞ্জার বলেন, তারা আমেরিকাকে পিকিং থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়।

কিসিঞ্জার এখানে আমেরিকারও তিনটি চাওয়ার কথা উল্লেখ করেন :

১. পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যেন ধ্বংস না হয়।

২. চীনের সঙ্গে সম্পর্ক যেন ঠিক থাকে

৩. বিশ্বের সামরিক ভারসাম্য যেন রাশিয়ার দিকে ঝুঁকে না পড়ে

কিসিঞ্জার বর্তমান অবস্থাতে স্টেট ডিপার্টমেন্টের পরামর্শের বিষয়ে বলতে চান, এই অবস্থাতে আমেরিকার কিছুই করা উচিত নয়, বরং পাকিস্তানের কাশ্মীরের অধিকৃত অংশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়া উচিত এবং পূর্ব পাকিস্তানকে (বাংলাদেশ) ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু কিসিঞ্জারের মতে রাশিয়ানেরা স্টেট ডিপার্টমেন্টের চেয়ে আরো ভালো প্রস্তাব রাশিয়া দিয়েছে।

নিক্সন জানতে চান, রাশিয়া এখন পশ্চিম আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা চাচ্ছে? কিসিঞ্জার মনে করেন, পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতা হলে রাশিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না-ও দিতে পারে।

তবে এই সমঝোতার মধ্যে বাংলাদেশ নামটা উল্লেখ থাকবে না, উল্লেখ থাকবে আওয়ামী লীগের নাম এবং এই সমঝোতার ভিত্তি হবে ১৯৭০-এর নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে স্বীকৃতি দিবে, আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের দাবী থেকে সরে আসবে এবং সোভিয়েতরা বাংলাদেশ ও ভারত থেকে তাদের সংযুক্তিকে বিচ্ছিন্ন করবে।

কিসিঞ্জার এখানে স্পষ্ট করে বলেন, আমি মনে করি বঙ্গোপসাগরে ক্যারিয়ার না পাঠিয়ে তারচেয়ে হেলিকপ্টারশিপ পাঠানো এবং তার সঙ্গে কিছু এস্কর্ট

ভেসেল পাঠানো যেতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারব এটা আমরা পাঠিয়েছি আমেরিকান নাগরিকদের নিষ্ক্রমণের জন্যে। এই আলোচনায় জানা যায় পাকিস্তানে সেই সময়ে ৫০০ আমেরিকান ছিল, এর মধ্যে ২০০ আমেরিকান ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

কিসিঞ্জার-নিক্সন কথোপকথনে একসময় তাঁরা দুজন একমত হয়ে বলছেন, 'বাস্তবতা হলো পাকিস্তান হয়ে গিয়েছে'। অর্থাৎ এটার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তাদের মূল উদ্বেগ পশ্চিম পাকিস্তানের কাশ্মীরে ঢুকে যাতে ভারত তা দখল না করে। এটা ঠেকাতে হবে, শুধু এ-কারণেই তাদের সব কসরত।

সূত্র : Vol E7 No 168 US Documents south asia

২০

মুক্তিযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা করেছিল আমেরিকা

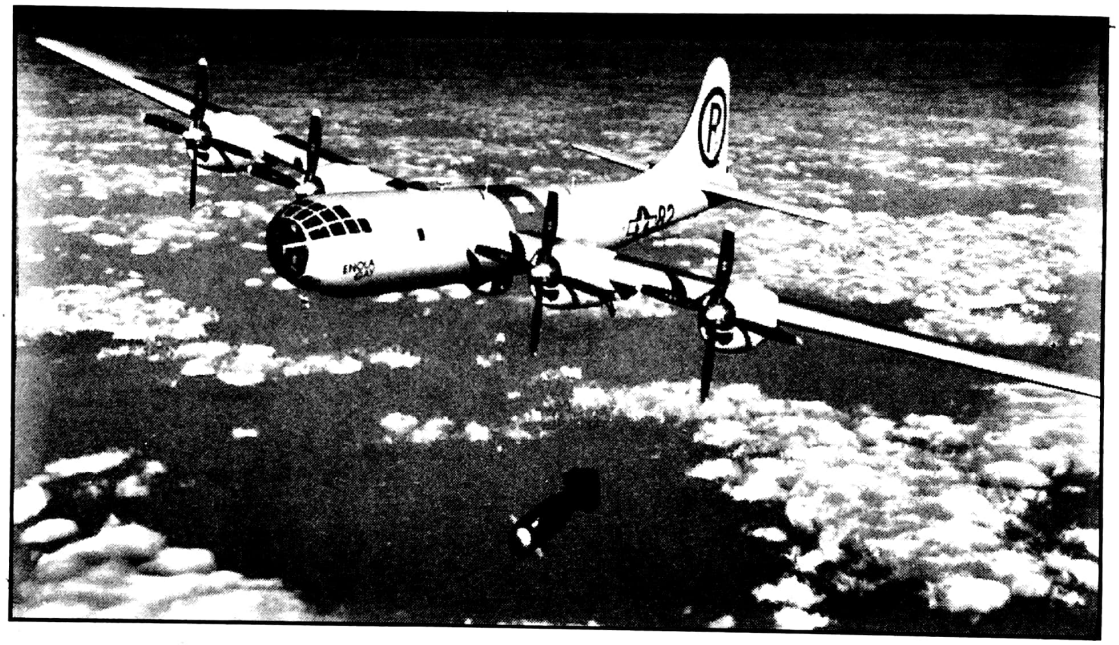

১২ ডিসেম্বর ১৯৭১। খুব সকালেই ব্রেজনেভের প্রস্তাব নিয়ে নিক্সন আর কিসিঞ্জার আলোচনা করেন। কিসিঞ্জার জানান, আমাদের চাপে পড়ে ইয়াহিয়া ব্রেজনেভের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু আরও চিন্তা করার পরে ইয়াহিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তিনি ব্রেজনেভের ঐ প্রস্তাব মানবেন না।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা বিশেষ করে কিসিঞ্জার এই প্রস্তাব মানতে ইয়াহিয়াকে চাপ দিয়েছিলেন । কিসিঞ্জারের আলাপে বোঝা যায়, এতে নিক্সনের তেমন সায় ছিল না। যদিও কিসিঞ্জার মনে করেন, ব্রেজনেভের এই প্রস্তাবে আমেরিকার রাজী হওয়াটা উচিত হয়নি এবং আমেরিকার এর থেকে দূরে থাকাই উচিত ছিল।

একাত্তরের ডিসেম্বরের পরিস্থিতিটা ছিল এমন যে মুক্তিযোদ্ধা সহযোগে ভারত পাকিস্তান আক্রমণের পরে জাতিসংঘে কোনও যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব যদি পাশ হয়ে

যায় তবে তাতে পরিস্থিতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানী সৈন্যদের হঠানো আটকে যেতে পারে বা লম্বা সময়ের জন্যে স্থগিত হয়ে যেতে পারে। তবে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যদি এমন প্রস্তাব আসে সেটা সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগে আটকে দেয়া গেলেও সাধারণ পরিষদে তা আটকানো যায়নি। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে একদিন আগে ইন্দিরা গান্ধীকে বলতে হয়েছিল যে 'আমরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানছি না বিষয়টা তা নয় বরং আমরা এই প্রস্তাবটা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে বিশেষভাবে বিবেচনা করছি'।

নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীর এই মন্তব্যকে বিশ্লেষণ করে এ ব্যাপারে কিসিঞ্জারকে বলেন, তিনি মনে করেন ইন্ডিয়া তখনও জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত না মানায় একটা আন্তর্জাতিক চাপে আছে। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর একদিন আগের বক্তব্য 'আমরা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানছিনা বিষয়টা তা নয় বরং আমরা এই প্রস্তাবটা বিশেষভাবে বিবেচনা করছি'–এর প্রমাণ। এই আন্তর্জাতিক চাপকে আরও কার্যকরভাবে কীভাবে এই পরিস্থিতিতে ভারতের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যায় সেবিষয়ে কিসিঞ্জার জানান, গত ছয় বছরে ইন্ডিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে ৭৩৯টি মাঝারি ট্যাঙ্ক, ১৭৬টি হাল্কা ট্যাঙ্ক আর ৩২৯টি ক্যারিয়ার বা যুদ্ধযান যোগাড় করেছে। জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব না মানা আর ছয় বছর ধরে যুদ্ধসজ্জার বিষয়টা আমেরিকার জনগণের সামনে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন এই দুজন রাজনীতিক। তাঁরা এটাও আলাপ করে নেন, এই সংকটে আমেরিকার জনগণের সমর্থন যেভাবে নেয়ার দরকার ছিল সেটা নেয়া হয়নি। বরং আমেরিকান জনমত প্রশাসনের উল্টোদিকে বইছিল।

চীন সম্পর্কে ভুট্টো কয়েকদিন আগে যে আলাপ করেছিলেন, সে ব্যাপারেও নিক্সন আর কিসিঞ্জার ঐ আলাপেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তা হলো, কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, তিনি ভুট্টোকে বলবেন, আমরা আমাদের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতোদিন কাজ করেছি, আমাদের আভ্যন্তরীণ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, আর আইনের খুব সংকীর্ণ রাস্তায় বর্তমান সংকট নিয়ে আমাদের অনেক কৌশল করে চলতে হচ্ছে। ফলে এই পরিস্থিতিতে চীনারা যদি সীমান্তে সেনা না পাঠায় তবে আমরা চীনাদের এই সংক্রান্ত কোনও কথাই আর শুনতে চাইনা। তারা যদি এবিষয়ে আর কোনও কথা বলতে চায় তবে তাদের সবার আগে সীমান্তে সেনা পাঠাতে হবে, সৈন্য নড়াচড়া দেখাতে হবে। নিক্সন এই প্রসঙ্গে চীনাদের ব্যাপারে হতাশার সুরে বলেন, "বুঝেছ হেনরি তোমার কথাই ঠিক"... চীনারা কাজের কাজ কিছু না

করে, বসে থেকে শুধু বকাবাজি করে যাচ্ছে। এরাই ব্রেজনেভের প্রস্তাব মেনে নেয়া অবস্থা থেকে ফিরিয়ে ইয়াহিয়াকে ভড়কিয়েছে।

এই আলোচনা চলতে চলতেই হোয়াইট হাউজের চিফ অব স্টাফ জেনারেল হেইগ রুমে ঢুকে চীনাদের একটি জরুরি বার্তা কিসিঞ্জারকে হস্তান্তর করেন। সেই বার্তায় লেখা ছিল, 'চীনারা জরুরি ভিত্তিতে দেখা করে কথা বলতে চায়।' এটা শুনেই কিসিঞ্জার প্রায় চিৎকার করে বলে ওঠেন, চীনারা ভারত সীমান্তে সেনা পাঠাচ্ছে, কোনও সন্দেহ নেই তারা মুভ করছে। আলাপটা ঘুরে যায় তখন এভাবেই যে এখন যদি চীনাদের ঠেকাতে সোভিয়েতেরা মুভ করে তাহলে আমেরিকা কী করবে? উল্লেখ করা যেতে পারে, আমেরিকাকে চীনাদের আগেই আশ্বস্ত করেছিল সোভিয়েতেরা যদি এই সংঘাতে চায়নাদের ঠেকাতে আসে তাহলে আমেরিকা বসে থাকবে না। কিসিঞ্জার বলেন, এখন যদি সোভিয়েতেরা চায়নাদের ঠেকাতে আসে আর আমরা কিছুই না করি তাহলে আমেরিকা একেবারে শেষ হয়ে যাবে। কিছু করা বলতে কী বোঝাচ্ছেন, কিসিঞ্জারের কাছে সেটা জানতে চায় নিক্সন। স্পষ্ট করেই নিক্সন জিজ্ঞেস করেন কিসিঞ্জারকে, কিছু করা মানে কি পারমাণবিক বোমা ছোঁড়া? কিসিঞ্জার এই পর্যায়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কথা শুনে বোঝা যায়। কিসিঞ্জার ও নিক্সন চাইছিলেন যেন চীনারা সেনা মুভ করায় সেই বার্তা এসেছে বলে যখন মনে করছে, তখন তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত এই অবস্থায় আমেরিকার কী করা উচিত তা নিয়ে। কিসিঞ্জার একবার বলেন, আমাদের চীনাদের এখন থামানো দরকার। আবার বলেন, যদি চীনাদের আমরা এখন থামাই, তাহলে আমাদের এতোদিনের চীনকে নিয়ে করা সব পরিকল্পনা পানিতে যাবে, পাকিস্তানকে ভারত খেয়ে ফেলবে, চীন সোভিয়েতদের হাতে ধ্বংস, অপমানিত হবে, পৃথিবীর ক্ষমতার ভারসাম্য এমনভাবে পরিবর্তিত হবে যে আমেরিকার নিরাপত্তাও তাতে বিঘ্নিত হবে আর অবশ্যই মধ্যপ্রচ্যে মারাত্মক দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হবে।

তবে শেষের এই কয়েক পাতা আমাদেরকে পড়তে হবে নিক্সন-কিসিঞ্জারদের লক্ষ্যের কথা মনে রেখে। সেটা হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে তাতে আপত্তি নাই, এটা তারা মেনে নিয়েছে। কিন্তু ভারত যেন এখানেই থেমে যায়, সব সৈন্য নিয়ে এরপর ভারত যেন পশ্চিম পাকিস্তানে রওনা না দেয়, চাপ সৃষ্টি করে পুরা কাশ্মীর দখলের পথে না যায়। এটা ঠেকানোই তখন আমেরিকার একমাত্র লক্ষ্য।

সূত্র : US Documents South Asia 1971, Volume E7, no 177

২১

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরে কিসিঞ্জার নিক্সনকে অভিনন্দন জানান

আমেরিকান সময় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর সকাল ১০:৪০। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও কিসিঞ্জারের কথোপকথন। আমাদের মনে হতে পারে পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পণের খবরে খুশি হয়ে (প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা) কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বোধহয় অভিনন্দন জানাচ্ছেন। সত্যিই আমি সরি, পাঠকের এই অনুমান ভুল। যদিও আমার দেয়া এই ডকুমেন্টের শিরোনাম হলো, '১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনীর আত্মসমর্পনের খবরে কিসিঞ্জার নিক্সনকে অভিনন্দন জানান।'

আজ বাংলাদেশের আমাদের মনে খটকা লাগতে পারে, এটা কেমন কথা যে ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের সারেন্ডারে বা বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিনে কিসিঞ্জার নিক্সনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন? হ্যাঁ, ব্যাপারটা একদম তাই। আর তাদের কথোপকথন থেকে টুকে আনা এর ভাষ্যটা হলো :

"Kissinger : Congratulations, Mr. President. You saved W. Pakistan."

সরাসরি ভাষ্যটা এখন দেখলে আরও জটিল লাগতে পারে যে পাকিস্তানের সারেন্ডারের ঘটনার মধ্যে পাকিস্তানকে বাঁচাবার (You saved W. Pakistan) প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? ঐটাই হল আসল ঘটনা।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, অনিবার্য। এটা নিয়ে নিক্সন প্রশাসনের কোনও সন্দেহ ছিল না, বহু আগে থেকেই। আর এ ধরনের অনিবার্য ঘটনা ঠেকানোর কোনও উদ্যোগ নেয়ার কিছু নেই। কিন্তু তাদের উদ্বেগের জায়গা ছিল ভিন্ন। সেটা হলো, যা আগেও দেখানো হয়েছে এ বইয়ে অনেকবার, তা হচ্ছে ডিসেম্বরের যুদ্ধের শেষবেলায় ভারতীয় সব সৈন্য পশ্চিম পাকিস্তানমুখি নিয়ে গিয়ে যেন এই সুযোগে ভারতীয়রা (পাকিস্তানের অংশে থাকা) কাশ্মীর ছিনিয়ে নিয়ে না যায়। সেটা ঠেকানোই আমেরিকানদের উদ্বেগের বিষয়।

এতদিনের সোভিয়েত প্রপাগাণ্ডা, কমিউনিস্টদের প্রপাগান্ডা আর একালে প্রথম আলোর প্রপাগাণ্ডায় আমরা শুনেছিলাম, বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়া ঠেকাতে নাকি আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল। এই ডাহা মিথ্যা কথা আমরা আগের লেখায় দেখেছি। আজ দেখব, আমেরিকা বরং এব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা চেয়ে চিঠি লিখেছিল (কিসিঞ্জারের লেখা সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট কোসিগিনকে)। কী লিখেছিলেন সেই চিঠিতে তার কপিও এখানে আছে। আর খোদ নিক্সন একাজে সোভিয়েত সহায়তা পাবার পর কিভাবে খুশি প্রকাশ করছেন, একইভাবে আরও কী কী ইস্যুতে কাজ আগানো যায় সে পরিকল্পনার কথা বলছেন। এমনকি আগের বিশেষত '৬৭ সালের আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধে কী কী সুযোগ হারিয়েছেন সেসব নিয়ে আপসোস করেছেন। এবং নিক্সন কথোপকথনে স্পষ্ট করে বলছেন :

President (Nixon): It's the Russians working for us. We have to get the story out.

অর্থাৎ সোভিয়েত সহযোগিতায় তিনি শুধু খুশি হয়েছেন তাই নয়, এই খবর তিনি ফলাও করে মিডিয়ায় আনতে চাইছেন। এব্যাপারে নাম ধরে ধরে কিসিঞ্জারকে বলছেন কোন কোন সাংবাদিক এই স্টোরিটা লিখবেন।

সারকথায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় আমেরিকা পাকিস্তান অংশের কাশ্মীর ভারতীয়দের ছিনিয়ে নেয়া ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। আর একারণেই

প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে কিসিঞ্জারের অভিনন্দন। আর সেই সঙ্গে পাঠককেও বুঝে নিতে হবে প্রপাগাণ্ডা কী জিনিস।

আগে বলে নেই আজকের প্রসঙ্গ দুটি টেলিফোন কথোপকথন, ১৫ এবং ১৬ ডিসেম্বর তারিখে।

১৫ ডিসেম্বর বিকেলে কিসিঞ্জার নিক্সনকে ফোন করেন তখন বাংলাদেশে ১৬ ডিসেম্বরের সকাল। উপরে কিসিঞ্জারের সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট কোসিগিনকে লেখা যে চিঠির কথা বলছিলাম, সেই চিঠি দিতে কিসিঞ্জার ভরন্তসভের কাছে গিয়েছিলেন আগেই। ফিরে এসে ১৫ ডিসেম্বর তিনি প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করছেন। এটা এরই কথোপকথন। প্রথমেই তিনি জানিয়ে দেন, আমেরিকায় সোভিয়েত দূত ভরন্তসভের সঙ্গে কী কী আলাপ হয়েছে। তিনি জানান সোভিয়েত পাওয়ার সেন্টারের আরেক নেতা সোভিয়েত কাউন্সিল অব মিনিস্টারের চেয়ারম্যান কোসিগিনকে একটা খসড়া চিঠি দেয়া হয়েছে, যেখানে তাকে বলা হয়েছে যেন জাতিসংঘে ব্রিটিশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। (এখানে নিরাপত্তা পরিষদে আনা ব্রিটিশ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের কথা বলা হচ্ছে)। জেনে রাখা ভালো, সেই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে একটা যৌথ নেতৃত্ব ছিল। যার শীর্ষে ছিলেন কোসিগিন, ব্রেজনেভ ও নিকোলাই পদগর্নি। কিসিঞ্জার বলতে থাকেন, পরিস্থিতি একেবারে সহ্যসীমার চরমে পৌছেছে এবং সবকিছুই একদম খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। এই পর্যায়ে কিসিঞ্জার বলেন, ইণ্ডিয়ানরেরা অবিশ্বাস্য আচরণ (কূটনৈতিক রীতি বা রেওয়াজ না মানা অর্থে) করছে। তারা বলছে, জাতিসংঘ যেন পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছে হস্তান্তরের প্রস্তাব মেনে নেয়। এটা আমরা মানতে পারি না, কারণ তাহলে জাতিসংঘ আগ্রাসনের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠবে। নিক্সন কিসিঞ্জারের এই কথায় সায় দেন। আমেরিকান অবস্থানের সারকথা হল, জাতিসংঘ আইনী দিক থেকে একথা বলতে পারে না। পাকিস্তান হেরে গিয়ে নিজে পূর্ব পাকিস্তানকে কর্তৃত্ব দিয়ে দিতে পারে, অথবা বাধ্য হয়ে শুধু বাংলাদেশের কাছে অথবা বাংলাদেশ-ভারতীয় যৌথবাহিনীর কাছে দিতে পারে। জাতিসংঘ কর্তৃত্ব দিতে গেলে নিজস্ব রেজুলেশনের পরে বাংলাদেশের গণভোটে ইত্যাদিতে সিদ্ধান্ত আর এরপরে তা করতে পারে।

কিসিঞ্জার এ-ও জানান সোভিয়েতরা জানিয়েছে তারা বৃটিশ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভেটো দেবে। এখন আমাদের দেখা দরকার সোভিয়েতরা আসলেই কী করতে চায়। নিক্সন বলে ওঠেন, তাদের আর ইন্ডিয়ানদের হাতে সম্ভবত

খুব খুব গরম আলু হাতে এসে পড়ার দশা হয়েছে। কিসিঞ্জার বলেন, যাই হোক, পলিটিক্যাল আউটকাম মোটামুটি একই, তারা চীনাদের অকথ্যভাবে অপদস্থ করেছে, আমাদেরকেও অপদস্থ করবে বোঝা যায়, যদিও আমাদের এখনো সেই অপমান ফেইস করতে হচ্ছে না। কিসিঞ্জার আরো জানান, জার্মান চ্যান্সেলর এই সংঘাতের বিষয়ে আমাদের বার্তা পাঠিয়েছেন, তারাও আমাদের মতোই যুদ্ধবিরতি চায়। এই সময় কিসিঞ্জার বলেন, ভুট্টো নিরাপত্তা পরিষদে একটা দারুণ বক্তব্য দিয়েছে, তাঁর কারণেই জার্মানদের এই অবস্থান হতে পারে। নিক্সন জানতে চান, তাহলে সোভিয়েতদের হাতে দেয়া চিঠিটা আসলে কোনও কাজে তো এলো না। কিসিঞ্জার বলেন, সোভিয়েতরা বলেছে, পশ্চিম পাকিস্তানকে ভারত আক্রমণ করবে না, তবে এই পশ্চিম পাকিস্তান বলতে এটার মধ্যে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্ত নয়। কিসিঞ্জার জানান, যদি পাকিস্তান তার অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ হারায় তাহলে সেটা তাদের জন্যে একদম শেষ অবস্থাই হবে। নিক্সন বলেন, আসলে এখন পুরো বিষয়টাই নির্ভর করছে সোভিয়েতদের উপরে। তারা কীভাবে ঘটনাগুলোকে অগ্রসর করে তার উপরে। এখনো পর্যন্ত অবস্থাকে ভালো বা খারাপ কোনও কিছুই বলা সম্ভব হচ্ছে না। এর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিসিঞ্জারকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমরা অবস্থা ভালো না খারাপ এর উত্তর কখন পেতে পারি? কিসিঞ্জার উত্তর দেন আগামীকাল। এই আগামীকাল মানে ১৬ ডিসেম্বর। অর্থাৎ ১৫ ডিসেম্বরের সেদিনের আলোচনা এখানেই শেষ হয়।

পরদিন যখন নিক্সনকে ফোন কল করেন কিসিঞ্জার, ততক্ষণে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকায় যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানান, ঢাকার পতন হয়েছে, ভারত একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। এবং বলেছেন, অভিনন্দন মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করেছেন।

সূত্র : Foreign Relations Of The United States, 1969–1976, Volume Xi, South Asia Crisis, 1971; Volume E7 No 191

১

ওহিদুল ইসলাম

অনেক চমকপ্রদ তথ্যসমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১* গ্রন্থটি একটানে পড়লাম। কিছু কিছু স্থানে রিভিশন করলাম।

যুদ্ধ খুবই জটিল একটি বিষয়। এতে দুটি পক্ষের বাইরেও দেশীয়, আন্তর্জাতিক অনেক জটিল পরিস্থিতি ও ঘটনা নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে বাঙালি (বাংলাদেশী) আর পাকিস্তানীদের বাইরেও ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কূটনৈতিকভাবে জড়িয়ে পড়ে দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইতিহাস তার গতিতেই চলে। কিন্তু আমরা নিজেদের মতো করে ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের গতিপথ বদলাতে চেষ্টা করি। তখন ইতিহাস বিকৃত হয়ে অনেক মিথের সৃষ্টি হয়। যুগ যুগ ধরে এসব মিথ যখন সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন প্রকৃত সত্যটি তথ্য উপাত্তসহ প্রমাণিত হলেও অনেকে সেটা গ্রহণ করার মতো উদার হতে পারেন না।

আলোচ্য গ্রন্থটি লেখকের নিজস্ব কোনো মতামতের প্রতিফলন নয়। গ্রন্থটির নাম-ভূমিকায়ও বিষয়টি স্পষ্ট। মার্কিন গোপন দলিলের নীতি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময় পর গোপনীয় দলিলগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। গ্রন্থকার প্রকাশিত ডকুমেন্টগুলির আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন মাত্র। বেশ কয়েকটি দুর্লভ ছবিও স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে, যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে হোয়াইট হাউজের সাউথ লনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও মিসেস নিক্সনের সাথে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হাস্যোজ্জ্বল ছবি।

রাশিয়াপন্থী বামদের মাধ্যমে আমেরিকার সপ্তম নৌবহর নিয়ে যে মিথ আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেটাকে তথ্য উপাত্ত দিয়ে ভুল প্রমাণ করেছেন গ্রন্থকার। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জানতো। কিন্তু আমেরিকার টেনশন ছিল কাশ্মীরকে নিয়ে। আজাদ কাশ্মীরে আক্রমণ করার পরিকল্পনা ছিল ভারতের। ভারতের সে পরিকল্পনা নস্যাৎ করাই ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য। এবং তারা সেটাই করেছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাধাগ্রস্থ করার কোনো চেষ্টাই আমেরিকা করেনি বরং এ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ও ভারতের সঙ্গে কূটনীতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিতই করেছে। আমেরিকা চেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া থেকে রক্ষা করতে। ভারত সোভিয়েতের প্ল্যান ছিল ভারতের সাথে পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তের আজাদ কাশ্মীর ও আরো কয়েকটি প্রদেশে আক্রমণ করা কিংবা

বিদ্রোহী গ্রুপ সৃষ্টি করে প্রদেশগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা। মার্কিন কূটনীতি সেটা সফল হতে দেয়নি। কারণ এটা ছিল আমেরিকার অর্থনৈতিক স্বার্থ, পাকিস্তানের মাধ্যমে চীনের বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করছিল আমেরিকা তখন।

গ্রন্থটির অনেক চমকপ্রদ তথ্যের মাঝে আরেকটি তুলে ধরছি। '৭১ সালের ১ জুলাই আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি আমেরিকার কাছে মধ্যস্ততার প্রস্তাব নিয়ে যান। আওয়ামী লীগের গণপরিষদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইউম কলকাতায় মার্কিন কূটনীতিকদের জানান, আওয়ামী লীগের নেতারা ঘটনাবলীতে উদ্বিগ্ন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে আগ্রহী। সেই সময়ের ৮টি মার্কিন ডকুমেন্টে এই বিষয়টি আছে।

গ্রন্থটি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। তবে ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাকার অনেকের ব্যক্তি-আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। ব্যক্তি-আক্রমণ করছেন তারা, যারা নিজেদের প্রগতিশীল দাবি করেন– তাদের বিরোধীপক্ষকে দাবি করেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি হিসেবে। প্রগতিশীলদের (!) এমন নির্লজ্জ প্রতিক্রিয়াশীলতা বেশ কৌতুকপ্রদ বটে!

লক্ষ্যণীয় যে, এ সমালোচকরা কেউই গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করছেন না। গ্রন্থটির কোনো রেফারেন্স সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন না। কারণ কী? কারণ হচ্ছে সঠিক তথ্য উপাত্তসমৃদ্ধ গবেষণাগ্রন্থটির তথ্যাবলীকে মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কোনো রসদ তাদের কাছে নেই। তাই সে পথে না গিয়ে বেছে নিয়েছে ব্যক্তি-আক্রমণ। এ তথাকথিত প্রগতিশীলদের ব্যক্তি-আক্রমণ হতে রেহাই মিলেনি সুভাষ চন্দ্র বসুর নাতনী ড. শর্মিলা বসুর একই 'অপরাধে'। তিনিও যে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে 'ডেড রেকনিং' নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

২

কমরেড মাহমুদ

বিশিষ্ট গবেষক পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* '৭১ বইটি পড়লাম। বইটি উনার লেখা বলতে উনার নিজস্ব কোন কথা তেমন নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমেরিকার ভূমিকা কী ছিল তার তথ্য প্রমাণগুলো এক জায়গায় করে তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটি রেফারেন্স বুক বলতে পারেন।

গত রমজানের ঈদে পিনাকী সাহেব যখন থাইল্যান্ড এসেছিলেন তখন আমাকে তার হোটেলে ডিনারের দাওয়াত করেছিলেন। ঈদের দিন উনার হং দ্বীপ থেকে ফিরতে বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় অবশেষে দেখা হয়নি। খুব ইচ্ছে ছিল সামনাসামনি দেখা হলে স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেওয়া মানুষটার সাথে কিছু আলাপ জমাবো। সেই পিনাকী সাহেবের ব্যতিক্রম ইস্যুতে লেখা বইটি বের হলে বইটি না পড়ে থাকতে পারিনি। এজন্য www.boibajar.com-কে ধন্যবাদ জানাই আমাকে বইটি পাঠানোর জন্য।

বইটি বাংলাদেশের চেতনাধারীদের জন্য বেশ একটি ধাক্কা দিবে বলে মনে করছি। ছোটকাল থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেসব ইতিহাস শিখেছি তার ভেতর

ম্যাক্সিমাম মনগড়া ইতিহাস। কোন তথ্য ছাড়া নিজের মতো করে লিখেছেন একেকজন। ছোটকালে স্কুলে থাকতে জেনেছি আমেরিকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সপ্তম নৌ-বহর সাগরে ভাসিয়ে ছিল। এর মাঝে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় তারা ফিরে যায়। যদি একবার সেই নৌ-বহর আমাদের জলসীমানায় ঢুকে পড়তো, এই জীবনে স্বাধীনতা পাওয়া হইত না! এই ইতিহাসটি পড়তাম আর মনে মনে বলতাম, আল্লাহ্ বাঁচিয়েছেন, শা..র ৭ম নৌ-বহর আসার আগেই আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছি! না হলে উপায় কী হতো!

এভাবে ভারত রাশিয়া ব্লকের বানানো অনেক মিথ্যা ইতিহাসকে এই বইটি তথ্য প্রমাণ দিয়ে তছনছ করে দিয়েছে। আম বাম মহোদয়গণেরা চল্লিশ বছরে যা যা প্রচার করেছে একটি বই দিয়ে পিনাকী সাহেব তাদের ডাইরেক্ট চল্লিশা করে দিয়েছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিক্রয়কেন্দ্রে বইটি রাখা অতীব জরুরি। কারণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমন তথ্যপূর্ণ নথি নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এমন একটি রেফারেন্স বুক খুবই দরকার আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য।

জানতে পারলাম বইটি নাকি কর্তৃপক্ষ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিক্রয় কেন্দ্রে রেখেছিল, তারপর কারো ইশারায় বইটি সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে! মিথ্যা ইতিহাস এই জাতি আর কতদিন চোখ বুজে সইবে, সেইটাই বুঝতেছি না!

৩

নির্ঝর ঢাকা

পিনাকী ভট্টাচার্যের *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* '৭১ বইটা হাতে পেতে একটু সময়ই লাগল। তৃতীয় মুদ্রণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো। বইটির পাঠকপ্রিয়তায় এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় মুদ্রণে যেতে হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে জ্ঞানচর্চার জন্য একটা ভালো দিক।

কিছুদিন আগে একটা ঘরোয়া আলোচনায় এইজিং সাপোর্ট ফোরামের সভাপতি হাসান আলী ভাই বলছিলেন, যে কোন জাতির ইতিহাস ৫০ বছর পরে নতুন বয়ান, নতুন ডাইমেনশন নিয়ে হাজির হয়। আমাদের এটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় এবং তা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে জনপ্রিয় অ্যাক্টিভিস্ট, লেখক পিনাকী ভট্টাচার্যের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জনপ্রিয় ডমিন্যান্ট বয়ানকে সম্পূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে।

বইটির ভুমিকা লিখেছেন আবু বিন রিয়াজ। ভূমিকার একটা কলামের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় সোভিয়েত বামদের দেওয়া বয়ানগুলোকে কিভাবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

"অসহযোগ আন্দোলনের আগে চরম উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আমেরিকার সমর্থন নেওয়ার জন্য তাঁর নানান রাজনৈতিক চিন্তার কথা আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে বলেছিলেন। যাতে করে আমেরিকা তাঁকে রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করে। বিচ্ছিন্ন

না হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ন্যায্যভিত্তিক কনফেডারেশনের আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি বলেছিলেন। শুধু তাই না, তাঁকে তাঁর কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী রাজনৈতিক অবস্থানের কথাও জানান ।"

ভূমিকার এই কলামটুকু পাঠ করলেই সোভিয়েত বামদের ডমিন্যান্ট বয়ানের ঠুনকতার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

বইটা উৎসর্গ করা হয়েছে বিশিষ্ট কলামিস্ট গৌতম দাসকে ।

বইটা নিয়ে আগামীদিনগুলোতে বেশ আলোচনা হবে তা টের পাওয়া যাচ্ছে এবং এই আলোচনার প্রয়োজন আছে আমাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের জন্য। গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা।

৪

রিফাত হাসান

মুক্তিযুদ্ধের আওয়ামী আধিপত্যবাদী ইতিহাস ও সে বিষয়ক হেজিমনি, যা মূলত এই অঞ্চলে ইণ্ডিয়ান আধিপত্যের বৈধতা নির্মাণের হাতিয়ার, তাকে প্রশ্ন করা ও ভাঙা জরুরি কাজ বটে। এইটা আমার মত। মূলত, এই জায়গায় দাঁড়িয়েই, সম্ভবত দুই হাজার পনেরোর দিকে পিনাকী ভট্টাচার্যের সাথে একটা তর্ক ও আলাপ হয় আমার, ফেসবুকে। মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকা প্রণয়নের খালেদার আহ্বানের ঔচিত্য নিয়ে পিনাকী প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি বলছিলাম, এই আহ্বান রাজনৈতিকভাবে সঠিক আছে। বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ ও ইতিহাস নিয়ে আওয়ামী লীগের একটি জমিদারি ও নাগরিকদের প্রতি প্রজাসুলভ ভাব নির্মাণের প্রকল্প আছে, যাকে নিয়ে একটা ধর্মভাব তৈরি করা হয়ে গেছে। ইদানীংকার আমি ও আমাদের আলাপে এইটা আরো বড় আকারে দেখবেন। এই আওয়ামী ইতিহাস প্রকল্পের নৈতিক ভিত্তিগুলোকে প্রশ্ন ও গুড়িয়ে দেওয়া দরকার। কারণ এই ধরনের অসংখ্য মিথ ও ইতিহাস প্রকল্পের উপরে ভর করেই তাদের সব গুম-খুন-জননিপীড়ণ ও লুটপাটের বৈধতা তৈরি হয়।

এই জায়গা থেকেই, *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* '৭১ নামে পিনাকীর বইটি দেখতে চাই। এই বইয়ে পিনাকীর নিজের কোন মত নেই, কিছু ডকুমেন্ট আছে, যা সাতচল্লিশ বছর ধরে প্রচারিত মিথকে ভেঙে দিচ্ছে। এইটা দারুণ। এই বইয়ের প্রতি মানুষের যে রেসপন্স ও আগ্রহ, তাকে আমি ক্ষমতাসীনদের ইতিহাসপ্রকল্পে ফাটল ধরার ভয় ও আবার সেই ইতিহাসের বিপরীত আয়নায় নিজেরে ও বাংলাদেশরে দেখার আগ্রহ হিসেবেই দেখি। এই আগ্রহ আমাদের বর্তমানের প্রতি যে ভয় ও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাসভঙ্গ ও ক্ষোভ, নতুন ইতিহাসের আকাঙ্ক্ষা, তার জায়গা থেকে আসে। এমন না যে, এই ডকুমেন্টগুলো কোন নতুন আমেরিকার ধারণা তৈরি করবে। বরং তাদের নোটপত্রও যে খুঁজে-পেতে পড়া দরকার, তা মনে করিয়ে দেবে। ইতিহাস নামক কোন ধর্মপ্রকল্পের বাইরে থাকার আগ্রহ তৈরি করবে। এই আগ্রহের জয় হোক। আওয়ামী ইতিহাসপ্রকল্প নিপাত যাক।

৫

বৈরাম খাঁ

পিনাকী ভট্টাচার্যের সদ্যপ্রকাশিত বই *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১*। ডকুমেন্ট নিয়ে হাতা-হাতিতেই আমার যত আনন্দ। আর পিনাকী দাদার বইটাও একটা ডকুমেন্টের সংকলন। প্রথমে উলটে পালটে দেখে পরে পড়ে দেখলাম।

এই বইতে নাকি ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। সত্য ডকুমেন্ট প্রকাশ আর ইতিহাস বিকৃত করা এক সাথে যায় না, যেমন যায় না সাদা আর কালোকে এক করে ফেলা। ডকুমেন্ট প্রধানত ইতিহাসে যে সব ঘটনা ঘটে তার সামর্থ্যে প্রামাণ্য লিখিত দলিল। দাদার বইটিও স্রেফ একটা ডকুমেন্ট সংকলন, সেখানে উনি কিভাবে ইতিহাসের বিকৃত করে এই প্রশ্নের জবাবটা তাদের কাছেই চাচ্ছি, যারা একে ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে।

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা গোপন কোন ব্যাপার থাকলে সেগুলোকে ক্লাসিফায়েড ঘোষণা দেয়া হয়। ক্লাসিফায়েড ঘোষণা দেবার মানে হল সাধারণ মানুষ সেগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেখতে পারবে না। সেই নির্দিষ্ট সময় সাধারণত ৪০-৬০ বছর। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ৪০ বছর পর মার্কিন প্রশাসন তাদের অনেক ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট ডি-ক্লাসিফায়েড ঘোষণা দিয়ে সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এতে ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে না।

বরং এত দিন যে সব ইতিহাস বিকৃত হয়েছে তা সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে। আমি বলি, এটা পিনাকী দাদা শুরু করল, অনেক অনেক কিছু বাকি আছে, শুধু মার্কিন কেন? সোভিয়েত, ভারতীয়, পাকিস্তানী ক্লাসিফায়েড তথ্যগুলো যা ডি-ক্লাসিফায়েড হয়েছে সেগুলো নিয়ে নিজেদের স্বার্থে আমাদের আরো অনেক কাজ করতে হবে। না হলে মিথ্যা বিজয়ী হবে।

আমার নেশাই হলো অতীত ঘটনার ডকুমেন্ট হাতানো, ইতিহাসের গহীনে ডুব দিয়ে ডকুমেন্ট ঘেঁটে সত্য উদঘাটন করা। বাজারে কিন্তু এ সংক্রান্ত আরো বই আছে, তাই যখন শুনলাম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নাকি পিনাকী দাদার এই বই তাদের কাছে রাখতে অস্বীকার করেছে তখন বুঝলাম ডাল মে কুচ কালা হ্যায়। সত্যি ভালো কয়েকটা টপিকস দাদা নিয়ে এসেছে।

এবার বইটির সামান্য সমালোচনা করি, প্রতিটা ডকুমেন্টের রেফারেন্স দাদা দিয়েছেন, তবে রেফারেন্স সাধারণের পক্ষে খুঁজে পাওয়া দুস্কর, তাই সামনের সংস্করণে অরিজিন্যাল ডকুমেন্টের ছবি সংযোজিত করে দিলে অনেক ভালো হয়। সত্য উন্মোচিত হোক।

৬

মুনীর আহমেদ

পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা মানেই নতুন কিছুর নিশানা। পিনাকীর সাফল্য এটাই যে, তাঁর সাথে যাদের শত্রুতা, তারাও তাঁর লেখাকে উপেক্ষা করতে পারে না। এই বইতেও নতুন কিছুর নিশানা পেয়েছি।

এতদিন আমাদেরকে জানানো হয়েছে, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে আমেরিকা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তৎকালীন আমেরিকার নীতিনির্ধারকদের অন্দরমহলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যে আলাপ হয়েছে, তাতে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিত'র কোন চিহ্ন ছিল না। এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয়ই বটে। আমেরিকা জানতো বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তবে তাদের এমন একটা আশঙ্কাও ছিল, ভারত এই সুযোগে গোটা কাশ্মীর দখলে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকেও হাত বাড়ায় কিনা! যে কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের মাধ্যমে তখন আমেরিকা চীনের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। বইটার পরতে পরতে আছে এমনি নতুন নতুন চমক।

বাম স্যেকুলারেরা এতোদিন আমাদের যা শুনিয়েছে আমেরিকা আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, তা যে একেবারেই মিথ্যা; সেটা এই বই পড়ে বুঝতে পারবেন সহজেই। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। বইটা পড়ে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমেরিকার অন্দরমহলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অজানা তথ্য জেনে আমি উপকৃত হয়েছি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকার প্রকৃত ভূমিকা জানতে আগামীতে বইটি একটা দলিল হিসেবে সমাদৃত হবে, এমনটাই আমার ধারণা।

৭

মো. রেজাউল করিম

উইকিলিকস নামে অনলাইন প্রচার-মাধ্যম ২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক লাখ লাখ অপ্রকাশিত নথি নিজেদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দেয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এমনকি হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যকার মুখোমুখি আলাপের রেকর্ডও প্রকাশিত হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা দেশের একটি দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়, তবে তা খুব পাঠক-বান্ধব রচনা ছিল না। এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন পিনাকী ভট্টাচার্য। পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা মুক্তিযুদ্ধের শক্তিশালী দালিলিক গ্রন্থ *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১* প্রকাশিত হয়। অগাধ পড়াশোনা তাঁর, নিয়মিত প্রচুর পড়াশোনা করেন ও লেখেন। পেশায় তিনি চিকিৎসক হলেও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর লেখা দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। গ্রন্থকার গ্রন্থটি এমনভাবে প্রণয়ন করেছেন যা একই সাথে ইতিহাসাশ্রিত ও পাঠক-বান্ধব হওয়ার যোগ্যতা ধারণ করেছে।

গ্রন্থের প্রধান অধ্যায়গুলো হচ্ছে : বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বাধা দেয়ার জন্যে আমেরিকা পাঠায়নি, স্বাধীন বাংলা সরকার শপথ নেয়ার আগেই সি আই এ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছিল, পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্যে আমেরিকা পাকিস্তানকে চাপ দিয়েছিল, পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১০ ডিসেম্বরেই ঢাকায় জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক ইচ্ছে জানায়, সোভিয়েতরা আমেরিকান স্বার্থ রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে একসঙ্গে কাজ করেছিল।

গ্রন্থটিতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা খুবই স্পর্শকাতর। যদিও প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তথ্যসূত্র দেয়া হয়েছে, তথাপি স্পর্শকাতর তথ্যগুলোতে পাদটিকা ব্যবহার করে বিতর্ক এড়ানো যেত বলে মনে করি।

বিপুল আয়তনের মার্কিন ডকুমেন্টের কিছু নির্বাচিত ডকুমেন্ট নিয়েই গ্রন্থটিতে আলোচনা হয়েছে, সবগুলো নিয়ে নয়। এই আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা বা কূটনীতি নিয়ে যে-সব বয়ান চালু ছিল বা আছে তার সাথে আমেরিকান ডকুমেন্ট মিলিয়ে যেন পাঠক পড়তে পারেন। এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আবারো মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ডকুমেন্টগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। এই বইটি মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জানা-বোঝার জায়গাগুলো আরো পরিষ্কার করতে পারবে বলে মনে করি।

৮

সবুজ কবির

পিনাকী ভট্টাচার্যের লেখা *মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ '৭১* বইটি পড়লাম। বইটি নিয়ে নাকি অনেকে মন্তব্য করেছেন এখানে ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। পুরো বইটাতে ইতিহাস বিকৃতির কিছুই পেলাম না। বইটি কোন ইতিহাস বা গবেষণা গ্রন্থও বলে আমার মনে হয়নি। বইটিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে মার্কিন সরকারেরই প্রকাশিত কিছু দলিলের ভিত্তিতে লেখা। দলিলগুলি মূলত সেসময় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ভারত সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কূটনীতিকদের পাঠানো রিপোর্ট এবং সেই রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য নিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা ও মার্কিন নীতিনির্ধারণ বিষয়ে নিক্সন সরকারের বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণী। এই কার্যবিবরণীগুলি দীর্ঘদিন স্বাভাবিক নিয়মেই গোপনীয় ছিল। যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচলিত আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পর জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সেসময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণ থেকেও কিছু তথ্য নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ে মার্কিন প্রকাশিত দলিলগুলির সার-সংক্ষেপকে গ্রন্থকার বাংলায় নিজের মতো করে উপস্থাপন করেছেন।

বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত কিছু মতকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মিথ্যা প্রমাণের দায়িত্ব শুধু গ্রন্থকারের নয়। বরং মার্কিন সরকারের দলিল এটাই প্রমাণ করে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই তারা মোটামুটি এটা নিশ্চিত ছিল যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তারা এটাই চেষ্টা করছিল, তৎকালীন বাইপোলার বিশ্বে সোভিয়েত জোটভুক্ত ভারত যেন পাকিস্তান তথা পশ্চিম পাকিস্তানকে গ্রাস করতে না পারে। অন্যদিতে স্বাধীন বাংলাদেশও যেন সোভিয়েত বলয়ে না ঢোকে। বইটিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আস্থাভাজন দেখানোকে অনেকেই ভুল মনে করতে পারেন। কিন্তু এটা ভুল নয়। শেখ সাহেব মুক্তিযদ্ধের সামান্য আগেও মার্কিনপন্থী হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীরও এই পরিচিতি ছিল। সোহ্‌রাওয়ার্দী সম্ভবত প্রথম পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের একটা অংশও গোপনে শেখ সাহেবকে মার্কিন দালাল বলে সম্বোধন করত। কবি আল মাহমুদ তাঁর এক প্রকাশিত আলাপচারিতায় বলেছেন, যখন মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব আন্দোলন চলছে, তখন আরেকজন বিখ্যাত কবি তাঁকে রাস্তায় থামিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি কেন 'ভণ্ড মার্কিন দালাল শেখ মুজিব'কে সমর্থন করেন!

বইটিতে গ্রন্থকার নিজের থেকে কোন বিশেষ মত বা থিওরি প্রকাশ করেননি। শুধু মার্কিন দলিল থেকে নেওয়া তথ্যগুলোর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। তাই এই বইয়ের জন্য কোনভাবেই গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় না। অভিযোগ যদি করতেই হয় সেটা করা প্রয়োজন মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে। আর এই অভিযোগ বাংলাদেশ বা ভারত থেকে পাকিস্তানেরই বেশি করা উচিত যে কেন আমেরিকা প্রায় নিরপেক্ষতার ভান ধরে পাকিস্তানকে দুইভাগ হতে দিল! বইটির তথ্যগুলোর অনুসমর্থন করা হয়েছে ভারতীয় জেনারেল জেএফআর জ্যাকব-এর *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : বার্থ অফ এ নেশন* বই ও এর পরিশিষ্টে সংযুক্ত কিছু মার্কিন দলিল থেকে। এছাড়া ড. জি ডব্লিউ চৌধুরীর *লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান* বইতেও মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা আছে।

জহির রায়হানের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক একটি গল্প আমাদের এসএসসি পরীক্ষায় পাঠ্য ছিল। *সময়ের প্রয়োজনে* গল্পটিতে এক জায়গায় এক মুক্তিযোদ্ধা সহযোদ্ধাদের প্রশ্ন করছে আমরা যুদ্ধ করছি কেন? একেক জন একেক রকম উত্তর দেয়। শেষে গ্রন্থকারের জবানীতে উত্তর দেন যে যুদ্ধ হচ্ছে সময়ের প্রয়োজনে। আসলেই এটাই একমাত্র সত্য। সময়ের প্রয়োজন ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের। সেটা হয়তো যুদ্ধ ছাড়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেও অর্জিত হতো। কিন্তু পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের অযোগ্যতা ও জোর করে জনগণের মত পরিবর্তন করার চেষ্টাই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা করেছিল। সাথে ভারতেরও কিছু কূটনৈতিক উদ্যোগ ছিল সন্দেহ নেই। আজ ৪৬ বছর পর ১৯৭১ সালে কে যুদ্ধ করেছিল কে বিরোধিতা করেছিল সেটা নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করাও একটা বোকামী। বরং সময়ের প্রয়োজনটুকু মেনে নিয়ে ভবিষ্যেতের দিকে তাকানো উচিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জন্য।

এই বইয়ে
আমেরিকা আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রচলিত বয়ানের বিপরীতে যা যা পাবেন :

"বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বাধা দেয়ার জন্যে আমেরিকা পাঠায়নি"

"স্বাধীন বাংলা সরকার শপথ নেয়ার আগেই সি আই এ মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষুদ্র অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছিল"

"পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্যে আমেরিকা পাকিস্তানকে চাপ দিয়েছিল"

"পাকিস্তান সেনাবাহিনী ১০ ডিসেম্বরেই ঢাকায় জাতিসংঘের কাছে আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক ইচ্ছে জানায়"

"সোভিয়েতরা আমেরিকান স্বার্থ রক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে একসঙ্গে কাজ করেছিল"

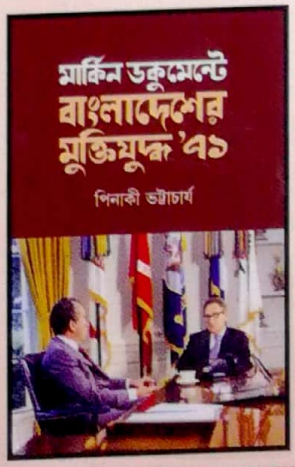

সূচীপত্র

Markin Documente
Bangladesher Muktijuddho '71
by Pinaki Bhattacharya
Published by Sucheepatra
Cover Design : Saeed Bari
e-mail : saeedbari07@gmail.com
www.facebook.com/sucheepatra
www.rokomari.com/sucheepatra

ISBN 978-984-92130-7-9
9 789849 213079